দাম : ষোলো টাকা

# স্বস্তিকা

মুর্শিদাবাদ জেলা
জেহাদি প্রসারণবাদের ধারাবাহিক
পরীক্ষাগার — পৃঃ ১৩

৭৭ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ৫ মে, ২০২৫।। ২১ বৈশাখ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

# জেহাদিদের কবলে পশ্চিমবঙ্গ

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৭ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ২১ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৫ মে - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**

**দাম : ১৬ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।


# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ◻ ৫

**কাশ্মীর থেকে কলকাতা—জঙ্গি উচ্ছিষ্টদের স্বর্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ : পাপের ঘড়া পূর্ণ** ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

**পাকিস্তানের ভরসা আমার দিদি** ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

**সঙ্ঘশাখা এক প্রসারিত পরিবার** ◻ মধুভাই কুলকর্ণী ◻ ৮

**হিন্দুদের হিন্দুনামে এক হতে হবে**
◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১০

**মুর্শিদাবাদ জেলা—জেহাদি প্রসারণবাদের ধারাবারিক পরীক্ষাগার**
◻ ড. বিনয়ভূষণ দাস ◻ ১৩

**ওয়াকফ সংশোধনী আইন ছিল সময়ের দাবি**
◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ১৫

**হিংসার উৎকট উৎসবে ত্রস্ত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা**
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৭

**ওয়াকফ তো বাহানা, আসল উদ্দেশ্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ**
◻ মন্দার গোস্বামী ◻ ২৩

**ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলনের নামে পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি শক্তির উত্থান** ◻ ড. তরুণ মজুমদার ◻ ২৪

**রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশবোধ—এক বহুমাত্রিক চেতনা সংকলন**
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ৩১

**সঙ্ঘশক্তির এক আশ্চর্য রূপকার আদি শঙ্করাচার্য**
◻ ড. সর্বাণী চক্রবর্তী ◻ ৩৩

**রবীন্দ্র মূল্যায়নে অসফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**
◻ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ৩৫

**রাজ্য সরকার অযোগ্যদের বাঁচাতে যোগ্য শিক্ষকদের বলি চড়াল**
◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ৩৭

**বেছে বেছে হিন্দু হত্যা : মুর্শিদাবাদ হোক বা কাশ্মীর**
◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৩৯

**একটি মেয়ের কুড়িটি চিঠি—মৃত্যুপুরীর সঞ্জীবনী**
◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৪৩

**চিকেনস্ নেক করিডোরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছে ভারত**
◻ কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য ◻ ৪৫

**যুদ্ধে গেলে পাকিস্তানের পরিণতি কী হতে পারে?**
◻ কৌটিল্য ◻ ৪৭

**গল্পকথায় ডাক্তারজী** ◻ বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

**নিয়মিত বিভাগ :**

**◻চিঠিপত্র :১৯-২০◻অঙ্গনা : ২১◻সুস্বাস্থ্য : ২২◻সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০◻নবাঙ্কুর : ৪০-৪১◻সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯**


ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
১২ মে
২০২৫

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১২ মে
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## সন্ত্রাসবাদীদের ধর্ম হয় না?

'সব সন্ত্রাসবাদীই মুসলমান'— এই সত্যটা আবার সামনে এল। 'সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না'— এতদিন এসব কথা বলে যারা গলা ফাটাচ্ছিলেন তারা আজ কী বলবেন? মুর্শিদাবাদ থেকে কাশ্মীর— সর্বত্র বেছে বেছে হিন্দুহত্যা প্রমাণ করে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য হিন্দুধর্মাবলম্বীরা। ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা সন্ত্রাসবাদীদের আড়াল করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাদের মুখোশ আজ খুলে গেছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন সমাজতত্ত্ববিদ।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
**INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

*With Best Compliments from -*

**A Well Wisher**

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## হিন্দুর পলায়ন

যেখানে যেখানে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে সেখান হইতে হিন্দুকে পলায়ন করিতে হইয়াছে, ইহা একটি ইতিহাসসিদ্ধ সত্য। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে হিন্দুকে পলায়ন করিতে হইয়াছে, পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছে। সেই পলায়ন অদ্যাবধি অব্যাহত রহিয়াছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে কাশ্মীর হইতে হিন্দুদের পলায়ন করিতে হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও ধর্মের কারণেই হিন্দুকে পলায়ন করিতে হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও এই দেশের সেকু-মাকুরা একই বৃন্তে দুটি কুসুমের গান শোনাইয়াছে। ধর্মের কারণেই ভারত তথা বঙ্গের বিভাজন ঘটিয়াছে, তবু তাহারা সম্প্রীতির সংগীতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালি হিন্দুকে তাহাতে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালি হিন্দুর ভালো-মন্দ, আপন-পর বোধ, শত্রু-মিত্র ভেদ করিবার বিচারবুদ্ধি সবই ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মেরুদণ্ড নামক কিছু একটি হিন্দুর আছে, তাহাও তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর বাম শাসনে বাঙ্গালি হিন্দুকে তাহাদের ধর্ম ও পরিচয় দুইটিই ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাতের জন্যই লড়াইয়ের কথা শুনিতে শুনিতে ধর্মের জন্য লড়াই করিবার মানসিকতা ও উদ্যম দুটিই হিন্দু ভুলিয়াছে। এই ধর্মহীন ও পরিচয়হীন বাঙ্গালি হিন্দুকে লইয়া রাজ্যের বর্তমান শাসকদল পুতুলনাচের খেলা খেলিতেছে। কত অত্যাচার, কত অনাচার, ধর্মের উপর আঘাত, কত মৃত্যু, কত মাতা-ভগ্নীর সম্ভ্রমহানি— তাহাতেও বাঙ্গালি হিন্দুর ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্যানিং, নলিয়াখলি, ধুলাগড়, সন্দেশখালি, কালিয়াচক, মোথাবাড়ি, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, শীতলকুচি— কিছুই তাহারা মনে রাখে নাই। বাঙ্গালি হিন্দু অনুধাবন করিতেই পারে নাই যে, বর্তমান শাসকদলের নিকট হিন্দুর কোনো মূল্য নাই। যত মূল্য সমস্তই তাহাদের 'দুধেল গাই'দের প্রতি। এই 'দুধেল গাই'য়েরা হিন্দুদের জীবনজীবিকার ক্ষতি, মানসম্মানে আঘাত এবং নারীর সম্ভ্রমহানি করিলেও রাজ্য সরকার তথা রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার। কেননা, রাজ্যের শাসককে ক্ষমতার অলিন্দে টিকিয়া থাকিতে হইবে যে! এই দুধেল গাইয়েরাই যে বর্তমান শাসকদলের জীবনীশক্তি। ইহারা সেই জেহাদি যাহারা ধর্মের নামে দেশমাতৃকার বিভাজন ঘটাইয়াছে। যাহারা পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশ হইতে হিন্দুহত্যা ও বিতাড়ন অব্যাহত রাখিয়াছে। চৌত্রিশ বৎসরের বাম শাসন এবং বর্তমানে তৃণমূল রাজ্য সরকারের লালন পালনে ইহারা বলীয়ান হইয়াছে। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-তৃণমূল দল মতাদর্শগত দিক দিয়া পৃথক হইলেও হিন্দুধর্মের উপর আঘাত, হিন্দু মাতা-ভগ্নীর সম্ভ্রমহানি, হিন্দুহত্যা অথবা বিতাড়ন ঘটিলে ইহারা মুখে 'রা' টি পর্যন্ত কাড়িতে পারে না। কেননা, ভোট বড়ো বালাই। জেহাদিরাই ইহাদের প্রধান শক্তি। কিন্তু জেহাদিদের নিকট কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-তৃণমূল বলিয়া কিছুই নাই। তাহাদের লক্ষ্য শুধুই হিন্দু। তাহাদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত করা। সম্প্রতি তাহারা মুর্শিদাবাদে পূর্ণমাত্রায় তাহার মহড়া দিয়াছে। তিনদিন ধরিয়া জেহাদিরা সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান প্রভৃতি এলাকায় নির্বিরোধে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করিয়াছে, অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে, মন্দির চূর্ণ করিয়াছে, মাতা-ভগ্নীর সম্মনহানি করিয়াছে, এমনকী হত্যা পর্যন্ত করিয়াছে। রাজ্য সরকারের পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার। প্রাণভয়ে হিন্দুরা পার্শ্ববর্তী জেলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। জেহাদি আক্রমণে শেষপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ হইতেও হিন্দুদিগকে পলায়ন করিতে হইল।

কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-তৃণমূলের হিন্দু নেতাদের দুর্ভাগ্য যে তাহারা জেহাদিদের খেলাটি ধরিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ হয়তো পারিতেছেন। যেমন, কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর বিলম্বে হইলেও বোধোদয় ঘটিয়াছে। তিনি অতীব সত্য কথা বলিয়াছেন, জেহাদিদের যে বাড়বাড়ন্ত, এক্ষণে সাবধান না হইলে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির অস্তিত্বই থাকিবে না। ইহা পরিষ্কার যে, মুর্শিদাবাদে হিন্দুদিগের উপর যে আক্রমণ নামিয়া আসিয়াছে তাহা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিতেই এবং রাজ্য সরকারের মদতেই। কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদের বুঝিতে হইবে, কমিউনিস্ট বলিয়া তাহারা ছাড় পাইবেন না জেহাদিদের হাত হইতে। তাহারা ধনে-প্রাণে হত হইলেও পার্টি নেতৃত্ব জেহাদিদের পক্ষই অবলম্বন করিবে। জেহাদিদের সহিত সম্পর্ক তাহাদের ডিএনএ-তেই রহিয়াছে। সময় আসিয়াছে, রাজনীতি নির্বিশেষ সকল হিন্দুকে হিন্দু নামেই পরিচয় দিতে এবং সংগঠিত হইতে হইবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেহাদি শক্তির মদতদাতা কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-তৃণমূলের এই অশুভ জোটকে উৎখাত করিতেই হইবে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালি হিন্দুর রক্ষার আর কোনো পথ নাই।

## সুভাষিতম্

**ঐক্যং বলং সমাজস্য তদভাবে স দুর্বলঃ।**

**তস্মাৎ ঐক্যং প্রশংসন্তি দৃঢ়ং রাষ্ট্র হিতৈষিণঃ।।**

একতা হলো সমাজের শক্তি। একতাহীন সমাজ দুর্বল হয়। এজন্য রাষ্ট্রহিতৈষী ব্যক্তিগণ দৃঢ়ভাবে একতার প্রশংসা করে থাকেন।

## কাশ্মীর থেকে কলকাতা— জঙ্গি উচ্ছিষ্টদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ

# পাপের ঘড়া পূর্ণ

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

অনেকেই মানেন পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গি আর জেহাদিদের স্বর্গরাজ্য। ২১ শতাংশ মুসলমান ভোট, তা ভোটবাক্সে ৩৩ শতাংশ হয়ে যায়। শুনেছি ওটাই নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেতার সড়ক। আমার ভাবনা কেবল সাংস্কৃতিক জঙ্গিদের নিয়ে। এক অগ্রজ সাংবাদিক অধ্যাপক মাহমুদ মামদানির 'গুড মুসলিম ব্যাড মুসলিম' বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেন 'ভালো মুসলমান, মন্দ মুসলমান'। তাতে তিনটি দুনিয়ার কথা বলা হয়েছে— পশ্চিমি, ইসলামি আর সভ্য দুনিয়া। এই তিন দুনিয়াকে সামনে রেখে তথ্য-সহ দেখানো হয়েছে অসভ্য, বর্বর আর ধান্দাবাজ দুনিয়ার সভ্য কারা? কারা করে অন্তর্ঘাত, কারাই-বা প্রকৃত অস্ত্রধারী আর সাংস্কৃতিক?

এবার সরাসরি বলি, এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক জঙ্গিদের ধ্বংস করার সময় এসেছে। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নিরীহ হিন্দুদের উপর নৃশংস নরসংহার চালানো হয়। এ রাজ্যের ঔরসে জন্ম অপজাত অন্তর্ঘাতী সন্তানরা তাতে দুঃখ প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে যে নিরাপত্তার গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটেছে। নাহলে হতো না। সাংস্কৃতিক জঙ্গিদের বক্তব্য হলো— 'আসলে সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম নেই। অশান্তি করাই তাদের কাজ।' বুদ্ধি'বিক্রি'জীবীদের এই দল কতটা নপুংসক আর নির্লজ্জ যে তারা খুনি, জেহাদিদের অভিভাবক ও মুখপাত্র হয়ে তাদের মজহব চালিত সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ নিয়ে এই ধরনের চর্চা করে। ভারত বিরোধী কিছু বিদেশি পত্রিকার ধার করা বুলি আউড়ে তারা প্রচার করছে যে, দেশজুড়ে হিন্দুত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার কারণেই এমন ঘটনা ঘটছে। তাদের অভিযোগ— হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ও হিন্দুধর্ম তার জন্য দায়ী। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ভারত নাকি হিন্দুরাষ্ট্র।

বহিঃশত্রু পাকিস্তানি জঙ্গিদের পাশাপাশি অন্তর্ঘাতী এই দেশীয় শত্রুদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পাকিস্তানকে আমি 'পাপী দেশ' বলেই মনে করি। ১৯৪৭-এর কিছু রাজনৈতিক পাপকর্মের সমাহার থেকেই এই খণ্ডিত দেশটির সৃষ্টি হয়। সবধরনের ভারত বিরোধিতা ঘিরে তৈরি হয়েছিল এই অসম্পূর্ণ, ব্যর্থ দেশটির মেকি জাতীয়তাবাদ। ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে কোনোদিন মানেনি 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'-এর বুলি আউড়ানো পাকিস্তান। মোল্লাতন্ত্র আর ইসলামি সন্ত্রাসের মুখে ভারতবর্ষই যে একমাত্র 'হিন্দু' প্রতিরোধ, তা তাদের সবচেয়ে বড়ো চক্ষুশূল।

ইসলামি দুনিয়ার বেশিরভাগটাই ঘিরে রয়েছে খ্রিস্টান ও ইহুদি প্রতিরোধ। ইসলামি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি রক্তাক্ত সীমান্ত তৈরি হয়েছে খ্রিস্টান দেশগুলিতে এবং ইহুদিদের দেশ ইজরায়েলে। এহেন পরিস্থিতিতে জঙ্গি মোল্লারা ভারতকে কবজা করতে চায়। পহেলগাঁওয়ের ঘটনা প্রমাণ করেছে ভারতের পয়লা নম্বর শত্রু পাকিস্তানের হয়ে এ রাজ্যে কিছু সাংস্কৃতিক জঙ্গি-উচ্ছিষ্ট সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিজীবী সেজে আভাসে-আড়ালে তারা পাকিস্তানের গুণ গাইছে আর ভারতের খেয়ে-পরে ভারতের বুকে বসে ভারতেরই ক্ষতি করে চলেছে। তাতে স্থানীয় প্রশাসনের মদতও রয়েছে।

ভারতের একতা আর অখণ্ডতাকে ধ্বংস করতেই গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে চালানো হয় বেছে বেছে হিন্দুহত্যা। নির্বিচারে চলে নরসংহার। ঘটনার বর্ণনা করতে গেলে এ লেখা রক্তাল্পতায় ভুগবে। এই ঘটনায় এত রক্তপাত ঘটেছে যে তা মুছতে বা পূরণ করতে গেলে পাকিস্তান দেশটাকেই হয়তো ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এটা ঠিক যে নিরাপত্তা বিভাগকে কিছু না জানিয়ে বৈসারন উপত্যকা পর্যটকদের জন্য খুলে দিয়েছিল স্থানীয় প্রশাসন। সে গাফিলতি স্বীকারও করেছে ওমর আবদুল্লা চালিত জম্মু-কাশ্মীর সরকার। স্থানীয় প্রশাসনের এই গাফিলতি ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিনা আগামীদিনে তা জানার অবকাশ রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই গাফিলতি পূরণের ব্যবস্থা করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারও পহেলগাঁওয়ে নিরাপত্তা গাফিলতির বিষয়টি মেনে নিয়েছে। এ রাজ্যে ধারাবাহিকভাবে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চললেও তৃণমূল সরকারের কোনো হেলদোল নেই। তাই মোথাবাড়ি ও মুর্শিদাবাদে হিন্দু সম্পত্তি লুঠপাট ও হত্যার যে ঘটনা ঘটেছে, তাকে কাশ্মীরের ঘটনার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। কাশ্মীর থেকে কলকাতা— মুসলমান সন্ত্রাসী ও জেহাদিদের দ্বারা হিন্দু নিধন ও হিন্দু হত্যার যে ধারা চলছে, মুসলমান ভোট ভিক্ষা পাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা মানবেন না। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উলটো কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। কাশ্মীরে নিরাপত্তা গাফিলতি ছিল বলে মেনে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মমতা বলছেন তৃণমূল সরকারের কোনো গাফিলতি ছিল না। অথচ রাজ্য প্রশাসনের গাফিলতিতেই মোথাবাড়ি ও মুর্শিদাবাদে হিন্দু হত্যা এবং হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠ হয়। মমতার মতে কাশ্মীরে পাকিস্তানি জঙ্গি আর পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি জঙ্গি। পাকিস্তান যে কাশ্মীরে জঙ্গি পাঠিয়েছিল তা প্রমাণিত। মুর্শিদাবাদ আর মোথাবাড়িতে কারা হিন্দু নিধন ও হিন্দু নির্যাতন চালাল মমতা তা কোনোদিন বলতে পারবেন না। তাঁর মুসলিমি মাথা তাকে আটকে দেবে, আর তাতেই রাজ্য হবে জঙ্গিঘর, জেহাদিদের স্বর্গরাজ্য।

*(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)*

# পাকিস্তানের ভরসা আমার দিদি

পাকিস্তানপ্রেমীষু দিদি,

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে যে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে, সেটা কিন্তু পাকিস্তান পরিচালিত ‘অপ্রচলিত যুদ্ধে’র নমুনা। জানি আপনি মানবেন না কিন্তু পাকিস্তানের সেই চেনা কৌশলও এবার কিছুটা অচেনা। গত ২২ এপ্রিলের পরে সিপিএমের গণশক্তি এবং আপনার দলের জাগো বাংলা দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। এই দুই মুখপত্রের শিরোনাম দেখলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে পাপীস্তানের ছক কী। বানান ভুল নয় দিদি, ইচ্ছা করেই ‘পাপী’ লিখলাম।

দিদি, আপনি ওই ভিডিয়োটা দেখেছেন? পাকিস্তানের এক প্রাক্তন মন্ত্রী সে দেশেরই এক নিউজ চ্যানেল বসে বলছেন, ভারতের মধ্যেই পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকে রয়েছেন। কারা ‘সহানুভূতিশীল’, সে সব নামও ওই পাক রাজনীতিকের মুখে শোনা গিয়েছে। সবার আগে অরুন্ধতী রায় আর তার পরেই আপনার নাম। এর পরে সিপিএম, কংগ্রেসও আছে। সঙ্গে ইন্ডি জোটের অন্য দলের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু রাজনীতিকদের মধ্যে একমাত্র আপনার নামই বলেছে। গর্ব হচ্ছিল দিদি। পাকিস্তানের মন্ত্রীও আপনার উপরে ভরসা করে। আমার একটা স্লোগান মনে এসেছে। সাহস করে লিখছি দিদি--- ‘পাকিস্তান নিজের মমতাকেই চায়’।

পাকিস্তান চায় আপনাদের কাজে লাগিয়ে ভারত সরকারকে দুর্বল করতে। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান যেহেতু মনে করে, ভারতে পাকিস্তানের প্রতি ‘সহানুভূতিশীল’ লোকজনের সংখ্যা নেহাত কম নয়, সেহেতু পাকিস্তান এখনই সেই অংশের মধ্যে ভারত সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে একটা সংশয় তৈরি করতে চায়। অনেকে বলছেন, এটা আমাদের লজ্জা। কিন্তু আমার দিদি, গর্বই হয়েছে এটা ভেবে যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়েছেন পাক মন্ত্রী। আসলে আপনার অতীত জানে তো পাকিস্তান! বালাকোট, পুলওয়ামার সময়ে আপনি দেশে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন। এবারেও সন্দেহ তৈরি করতে চেয়েছেন।

তাই আমার মনে হচ্ছে, এবার পাক ছক আলাদা। ভারতকে টুকরো করাই লক্ষ্য। পাকিস্তানের পরমাণু বাতেলায় লজ্জা নেই মনে হচ্ছে। দেখুন, পাক রাষ্ট্রপতির পুত্র তথা পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি থেকে উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক ডার সবাই ভারতকে পরমাণু আক্রমণের হুমকি শোনাচ্ছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ থেকে রেলমন্ত্রী হানিফ আব্বাসি সবাই যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। রক্ত-সিন্ধু বইয়ে দেওয়ার কথা বলছেন তাঁরা। ১৩০টি পরমাণু বোমা ভারতের দিকে তাক করে রাখা আছে বলেও মন্তব্য করছেন। কিন্তু দিদি আমার বিশ্বাস, হুমকি, বাতেলা ছাড়া এদের আর কিছু করার নেই। তাই বাতেলায় ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সে সব তর্জন-গর্জনে খুব একটা চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

> **আমি ভাবতাম আপনার জনপ্রিয়তা শুধু পশ্চিমবঙ্গে। এখন দেখছি আপনার একটা আন্তর্জাতিক পরিচয়ও রয়েছে। সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন দিদি— ‘পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল’।**

জুলফিকর আলি ভুট্টো ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভাষণে বলেছিলেন, ‘ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান এক হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চালাবে।’ কিন্তু বেঁচে থাকতে কোনো যুদ্ধে পাকিস্তানের জয় দেখে যেতে পারেননি। বরং, ১৯৭১ সালে নিজের দেশকে দু’টুকরো হয়ে যেতে দেখেছেন। পরে সেনাপ্রধান জিয়া উল হক পাকিস্তানের মসনদ দখল করে বলেন, ‘উই উইল ব্লিড ইন্ডিয়া উইথ আ থাউজ্যান্ড কাটস্।’ মানে, পাকিস্তান ভারতকে এক হাজার বার ক্ষতবিক্ষত করবে।’ সেই থেকেই ভারতকে ‘ক্ষতবিক্ষত’ করার চেষ্টা পাকিস্তানের।

কিন্তু আমি সত্যি ভাবতেই পারছি না দিদি, আপনাকে তো ওরা এত কাছের মনে করে। আমি ভাবতাম আপনার জনপ্রিয়তা শুধু পশ্চিমবঙ্গে। এখন দেখছি আপনার একটা আন্তর্জাতিক পরিচয়ও রয়েছে। সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন--- ‘পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল’।

আজ বাঙ্গালির বড়োই গর্বের দিন। একটা সরকারি ছুটি ঘোষণা করে দিন। সঙ্গে বিনা খরচে দীঘায় বেড়ানোর সুযোগ। সবাই ফুর্তি করে পুরীর মন্দিরের মতো দেখতে ওইটাও দেখে আসবে। ▫

অতিথি কলম

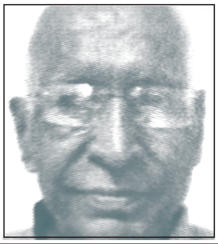

মধুভাই কুলকর্ণী

# সঙ্ঘ শাখা
# এক প্রসারিত পরিবার

**সম্পূর্ণ মানবতার কল্যাণের জন্য প্রার্থনায় বলা হয়— ‘সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া। সর্বে ভদ্রাণি পশন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।’**

ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জীবনীমূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষায় তার অনুবাদও হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত ক্ষেত্রে ডাক্তারজীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। যে কোনো বিষয়ের ওপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা তাঁর স্বভাব ছিল। স্বাধীনতা অর্জন করা চাই-ই, এরজন্য প্রয়োজন হলে আত্মবলিদানের মানসিকতাও থাকা চাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা পরাধীন কেন হলাম? কারা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করলো? যে রকম ইংরেজ আমাদের আপন ছিল না, সেরকমই মুঘল, তুর্কি, গ্রিকও আমাদের আপন ছিল না। এই বহিরাগত আক্রমণকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষকারী সমাজ কারা ছিল? এই দেশকে নিজের মনে করা, নিজ মাতৃভূমি মনে করা সমাজ কোন সমাজ ছিল?

এইসব বিষয়ের ওপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে ডাক্তারজী সিদ্ধান্তে পৌছন যে, এই দেশকে নিজের দেশ মনে করা সমাজ হলো হিন্দু সমাজ। হিন্দু সমাজের আত্মবিস্মৃতির কারণে রাষ্ট্রভক্তির ভাবনা ক্ষীণ হয়েছে। এই কারণে সমাজজীবনে বিকৃতি উৎপন্ন হয়েছে। তার ফলস্বরূপ স্বার্থবুদ্ধির মতো সংকুচিত মানসিকতাই আমাদের পরাধীনতার মূল কারণ। তাঁর মনে ভাবনার উদয় হয়, এই রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য হিন্দু সমাজকে আত্মবিস্মৃতি, বিকৃত মানসিকতা এবং স্বার্থপরতা— এই ত্রিদোষ থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। আসেতুহিমাচল বিস্তৃত হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার ভাবনা থেকেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থাপনা করেন।

‘হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে হবে’, একথা বলা খুব সহজ। সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের সংগঠনের সংকল্প মন আকর্ষণকারী বা বৈপ্লবিক ভাবনা। কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে এর জন্য কী করা প্রয়োজন? সদস্য কারা হবেন? সংগঠনের স্বরূপ কেমন হবে? এই বিষয়ে ডাঃ হেডগেওয়ার কোনোরূপ লিখিত নিয়মাবলী তৈরি করেননি। কার্যপদ্ধতি রূপে তিনি প্রতিদিন শাখার কথা বলেছেন। ত্রিদোষ দূর করার মতো কার্যক্রমের কথা বলেছেন। গৈরিকধ্বজ সামনে থাকার কারণে আত্মবিস্মৃতি দূর হয় এবং ‘আমরা সবাই হিন্দু’ এই অনুভূতি উৎপন্ন হয়।

সামূহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিকৃত ও ধ্বংসাত্মক স্বভাবে পরিবর্তন আসে। প্রার্থনার কারণে রাষ্ট্রভক্তির ভাব দৃঢ় হয়। সংকুচিত ভাবনার স্থানে সামাজিক কর্তব্যের ভাবনা নির্মাণ হয়।

ডাক্তারজী সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এই কারণে তাঁর ওঠা-বসা, কথাবার্তা, পত্র লেখা, দেখা-সাক্ষাৎ করা— সবকিছু সঙ্ঘের জন্য হতো। তাঁর আচরণ থেকে সঙ্ঘের রীতিনীতি নির্মাণ হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—(১) কুমার মাধব একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়ে নাগপুর থেকে কোঙ্কণ যাবেন। দুপুরে ট্রেন ছাড়বে। ডাক্তারজী বৃষ্টির মধ্যেও হেঁটে তাকে ছাড়ার জন্য স্টেশনে আসেন। চিঠি লিখে পৌঁছানোর খবর দেওয়ার কথা বলেন। তাঁর এই ব্যবহারের কারণে সেই যুবক সারা জীবনের মতো সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি প্রচারক রূপে পঞ্জাবে সঙ্ঘের কাজ করেন। তাঁর নাম মাধবরাও মুলে। (২) যবতমলের নবমশ্রেণীর ছাত্র স্কুল ছুটি থাকায় নাগপুরে তার মাসির বাড়ি এসেছিল। তার মাসির বাড়ির পাশেই একটি সায়ম্ শাখা ছিল। খেলাধুলার আকর্ষণে সেই বালক শাখায় আসতে শুরু করল। ডাক্তারজী যখন ওই শাখায় এলেন, সেই বালকের সঙ্গে পরিচয় হলো। শাখার পরে ডাক্তারজী তার সঙ্গে তার মাসির বাড়ি গেলেন। ডাক্তারজী নাগপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, এক ছোটো বাচ্চার কারণে এত বড়ো একজন লোক তাদের বাড়িতে এসেছেন, তা দেখে বাড়ির লোকেরা খুব প্রসন্ন হলেন। এই বালকের কারণেই যবতমলে একটি নতুন শাখা শুরু হয়। (৩) নানাজী দেশমুখ (চিত্রকুট গ্রাম বিকাশ প্রকল্পের পুরোধাপুরুষ) তাঁর স্কুল জীবনের কথা লিখে রেখেছেন। তিনি যখন ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়তেন, তখনকার কথা। শ্রীগন্ধে উকিলের বাড়ি তাদের বাড়ির পাশেই ছিল। একদিন তাঁর বাড়িতে অনেক লোকের যাতায়াত দেখা গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তাঁর বাড়িতে ডাঃ হেডগেওয়ার এসেছেন। নানাজী ডাক্তারজীকে কখনো দেখেনি কিন্তু দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। তিনি লিখেছেন—‘আমাদের পরীক্ষা ছিল। আমরা চার বন্ধু পরীক্ষা দিতে যাবার পথে গন্ধে উকিলের বাড়ি গেলাম। ডাক্তারজী আমাদের চার বন্ধুকে ডাকলেন এবং অত্যন্ত স্নেহভরে এক-একজনকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের ভয় ভেঙে গেল। আমরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি জানতে পেরে ডাক্তারজী গন্ধে উকিলকে দই-চিনি আনতে বললেন। ডাক্তার স্বয়ং আমাদের চারজনের হাতে দই-চিনি দিয়ে বললেন, যাও, তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে।’ (৪)বিশিষ্ট সাহিত্যিক আচার্য অত্রে এক স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘ ডাক্তারজী আমাদের বাড়িতে এসেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব অতি সুন্দর, গম্ভীর ও শান্ত। তিনি আমাদের বাড়িতে আসায় আমার মনে হয়েছে আমাদের বাড়ির কোনো লোকই বুঝি অন্য গ্রাম থেকে এসেছেন। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে কথাবার্তা বলছিলেন। আনুষ্ঠানিকতার পরিবেশ দূর হয়ে এক আনন্দের অনুভব হতে শুরু করল।’ (৫) বিদর্ভ প্রান্তের সমরসতা শিবির চলছিল। ত্রিশ হাজারেরও বেশি সংখ্যা ছিল।

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর সময় স্বয়ংসেবক হয়েছেন এমন ১০০-১২৫ জন প্রৌঢ় স্বয়ংসেবককে শিবির দেখার জন্য ডাকা হয়েছিল। তৎকালীন পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীরাজেন্দ্র সিংহ এবং মাননীয় সরকার্যবাহ শেষাদ্রিজীর সঙ্গে পরিচয়াত্মক বৈঠক চলছিল। মাননীয় শেষাদ্রিজী বললেন, আমি ও মাননীয় রজ্জুভাইয়া পূজনীয় ডাক্তারজীকে দেখিনি। আপনারা দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন। আপনারা কিছু বলুন।' চার-পাঁচজন প্রবীণ স্বয়ংসেবক স্মৃতিকথা শুনিয়েছিলেন। বলতে শুরু করতেই তাঁদের চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। 'ডাক্তারজী মানেই শুধু প্রেম, প্রেম আর প্রেম', এইটুকু বলেই তাঁরা বসে পড়ছিলেন।

সঙ্ঘকাজ সবসময়ই প্রেম ও আত্মীয়তায় পরিপূর্ণ। 'শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেম আমাদের কাজের ভিত্তি', এরকম একটি গান শাখায় শাখায় গাওয়া হয়। পরিবারের মতোই ভ্রাতৃভাবের অনুভব শাখায় হয়ে থাকে। পরিবারে যেমন ছোটো বড়ো সকলকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তেমনই শাখায় শিশু, বালক, তরুণ, প্রৌঢ় — প্রতিটি বয়সের স্বয়ংসেবককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে পরিবারের সকলের চিন্তা হয়। সেরকমই শাখার কোনো স্বয়ংসেবক অসুস্থ হলে সমস্ত স্বয়ংসেবক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। পরিবারে কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ এলে পরিবারের সবাই কাজে লেগে পড়েন। শাখার কোনো স্বয়ংসেবকের বাড়িতে কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান হলে শাখার সব স্বয়ংসেবক তার বাড়ি গিয়ে কাজে হাত লাগান। সবার বিশ্বাসযোগ্যতাই পরিবারের উন্নতির মূলকথা। সঙ্ঘ শাখার ভিত্তি হলো স্বয়ংসেবকদের সততা এবং পরস্পর বিশ্বাস। সঙ্ঘ শাখা মানেই এক প্রসারিত পরিবার। সঙ্ঘ বাড়ছে, তার কারণ হলো শাখায় সহজ সরল আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহার।

ডাক্তারজীর জীবদ্দশায় অর্থাৎ ১৯৪০ সালের মধ্যেই সঙ্ঘ অখিল ভারতীয় রূপ লাভ করে। ডাক্তারজীর আত্মীয়তার অনুভব করা যাচ্ছিল সর্বত্র। আমরা সঙ্ঘের অর্থাৎ অন্য কারও কাজ করছি—এরকম ভাবনা কারও মনেও আসে না। আমরা আমাদের পরিবারেরই কাজ করছি, এই ভাবনা ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের মনে নির্মাণ করেছেন।

১৯৪০ সালে নাগপুরে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে দীক্ষান্ত সমারোহে ডাক্তারজীর ভাষণ হিন্দু সমাজ সংগঠনের স্বরূপকেই পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত করে। তিনি বলেন, আমার এবং আপনাদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও এমন কোন কথা যে যার কারণে আমার এবং আপনাদের অন্তঃকরণ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তত্ত্বজ্ঞান এতই প্রভাবী যে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও দেখামাত্রই ভালোবাসা নির্মাণ হয়ে যায়। ভাষা ও আচার-বিচারের ভিন্নতা সত্ত্বেও পঞ্জাব, বঙ্গ, মাদ্রাজ, মুম্বই, সিন্ধ প্রভৃতি প্রান্তের স্বয়ংসেবকদের মধ্যে এত ভালোবাসা কেন? এজন্য যে তারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক-একজন ঘটক। সঙ্ঘের প্রত্যেক স্বয়ংসেবক পরস্পরকে সহোদর ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসে।

সেই প্রশিক্ষণ বর্গে এক থেকে দেড়হাজার স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারজী বলেন, এরা সবাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'ঘটক'। তিনি বলেলনি এরা 'সদস্য'। 'আমি সঙ্ঘের সদস্য' এরকম বলার অর্থ হলো 'আমি আর সঙ্ঘ আলাদা' এরকমই আভাস দেয়। 'যতক্ষণ আমার ইচ্ছা থাকবে, ততক্ষণ আমি সঙ্ঘের সদস্য থাকবো' এরকম ভাব উৎপন্ন হয়। 'আমি ঘটক' এরকম বলার অর্থ 'আমিই সঙ্ঘ'। সদ্যোজাত শিশুও সেই পরিবারের ঘটক হয়ে যায়। আমার হিন্দু সমাজে জন্ম হয়েছে, তাই আমি হিন্দু সমাজের ঘটক হয়ে গিয়েছি, একথা বলার পর হিন্দু সমাজের আনন্দ আর আমার আনন্দ আলাদা হতে পারে না। ঘটক হওয়ার এই ভাবনা প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে নির্মাণ করাই হিন্দু সমাজ সংগঠন করা।

'এক বড়ো পবিরার আমাদের, পূর্বপুরুষ আমাদের হিন্দু', এরকম পারিবারিক ভাবনা সমগ্র দেশে উৎপন্ন হোক, এই কাজ সঙ্ঘকে করতে হবে। ১৯৪০ সালের সেই বর্গের দীক্ষান্ত ভাষণে অতি আগ্রহভরে ডাক্তারজী একথার প্রতিপাদন করেছেন। হিন্দুজাতির চূড়ান্ত কল্যাণ এই সংগঠনের মাধ্যমেই হবে। অন্য কোনো কাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়সেবক সঙ্ঘ করবে না। 'সঙ্ঘ ভবিষ্যতে কী করবে?' এই প্রশ্ন নিরর্থক। সঙ্ঘ এই সংগঠনের কাজ আরও তীব্রগতিতে করে যাবে। এই পথে চলতে চলতে এমন এক সুবর্ণময় দিন নিশ্চিত আসবে, যখন সারা দেশ সঙ্ঘময় হয়ে যাবে।

দত্তোপন্ত ঠেংড়ী বলতেন, সঙ্ঘের ভাবাদর্শ ও কার্যপদ্ধতি ডাক্তারজীর কল্পনার উত্তরোত্তর আবিষ্কার। ১৯৪০ সালের ১৫ জুন যাদবরাও জোশীকে ডাক্তারজী কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তার দেহাবসান হলে তাঁর দাহকার্য কি সামরিক কায়দায় করবে? তিনি পরিষ্কার করে বলেন, সঙ্ঘ এক বড়ো পরিবার। পরিবারের লোক যেভাবে পরিবারের অভিভাবকের দাহকার্য করে থাকে, সেরকমই সঙ্ঘের অধিকারীরও হওয়া উচিত এবং হামেশা এভাবেই হওয়া উচিত।

ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের জন্য গণবেশ নিশ্চিত করেছেন। অনুশাসন নির্মাণের জন্য সমতা (প্যারেড), পথসঞ্চলন (রুটমার্চ)-এর মতো কার্যক্রম তৈরি করেছেন। আত্মবিশ্বাস বানানোর জন্য লাঠিখেলা শুরু করেছেন। হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য উগ্রমস্তিষ্ক যুবকদের দল খাড়া করার চিন্তা ডাক্তারজীর মনের মধ্যে ছিল না। আসেতুহিমাচল বিস্তৃত হিন্দু সমাজ যদি পারিবারিক ভাবনায় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে যায় তবে কারও পক্ষে আর হিন্দু সমাজের দিকে বাঁকা নজরে তাকানোর সাহস হবে না এবং সমস্ত রকম সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যাবে।

সমাজের প্রয়োজনের কথা ভেবে ডাক্তারজী নাগপুরে অনাথ বালকদের জন্য ছাত্রাবাস শুরু করেছেন। তাতে কোনোরকম ভেদভাব তিনি করেননি। গান্ধীজী, শঙ্কর নারায়ণ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়ের মতো ব্যক্তিত্ব এই ছাত্রাবাস পরিদর্শন করেছেন (তথ্য ঃ ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত 'ডাঃ হেডগেওয়ার' গ্রন্থ)।

গত একশো বছরে সঙ্ঘ এই পরিবার ভাবনায় সফল হয়েছে। স্বয়ংসেবকদের কোনো রাজ্যই পর মনে হয়নি। বহু স্বয়ংসেবক সমাজের বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে কাজ করছেন। সেখানেও তাঁরা পরিবার ভাবনা নির্মাণ করার কাজ করে চলেছেন। হিন্দু পরিবার বিশ্ব পরিবারের ক্ষুদ্র সংস্করণ। হিন্দু পরিবারে মা-বাবা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা, দাদু-দিদিমা, মামা-মামি, পিসি-মাসি ইত্যাদি সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দু পরিবারে কাক-পক্ষী, গোরুবাছুর, গাছপালা সবাই সদস্য। সবার পূজা করা হয়। সম্পূর্ণ মানবতার কল্যাণের জন্য প্রার্থনায় বলা হয়—'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া। সর্বে ভদ্রাণি পশন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।' তাই বসুধৈব কুটুম্বকমের কল্পনাকে সাকার করার জন্য হিন্দু পরিবারেকেই এগিয়ে আসতে হবে। তারজন্য বিশ্বের ৬০টি দেশে হিন্দু সংগঠনের কাজ চলছে।

**(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)**

# হিন্দুদের হিন্দুনামে এক হতে হবে

**শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী**

সেকুলারিজমের বিষবৃক্ষের ফল ফলতে শুরু করেছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বহু পরিশ্রমের ফসল হিন্দু বাঙ্গালির শেষ আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে কাশ্মীর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো হিন্দুর বধ্যভূমিতে পরিণত হচ্ছে। বিগত প্রায় এক পক্ষকালের ঘটনাক্রম সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। ১৯৪৭ সাল থেকে কংগ্রেস ভারতকে ইসলামের পদতলে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য 'ওয়াকফ' নামে একটি কালসাপ পুষতে শুরু করেছিল। পরবর্তীতে তাকে দুধ কলা দিয়ে বড়ো করেছেন ইন্দিরা, নরসিম্হা, মনমোহন সিংহরা। তাঁদেরই পালন-পোষণে ওয়াকফ আজ নয় লক্ষ ৪০ হাজার একর জমির মালিক, যা আয়তনে পাকিস্তানের প্রায় সমান। তাদের এমনই দৌরাত্ম্য এই পশ্চিমবঙ্গের রেড রোড, ইডেন গার্ডেন, রাজভবন, ভিক্টোরিয়া থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের ১৪ তলার নবান্নটিকেও তারা ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। জল একন মাথার উপর দিয়ে বইছে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা দেশই আজ এদের দৌরাত্ম্যে অস্থির। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ বোর্ডের এই স্বেচ্ছাচার রুখতে লোকসভা ও রাজ্যসভায় অনেক আলোচনা ও বিতর্কের শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে এয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল-২০২৫ সংসদে পাশ করিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, বলছে 'এই আইন তারা এরাজ্যে লাগু হতে দেবে না।' এক মন্ত্রী বলছেন, 'চাইলে কলকাতাকে লক্ষ লোক দিয়ে স্তব্ধ করে দেবো, আগে গ্রাম বাংলাটাকে একটু শায়েস্তা করে দি'। সেই শায়েস্তা করা শুরু হয়েছে ৭ এপ্রিল থেকে। মুর্শিদাবাদে এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে চলছে জেহাদি আক্রমণ। প্রাণ বাঁচাতে ভিটেমাটি ছেড়ে হিন্দুরা আশ্রয় নিচ্ছে পাশের জেলায়, পাশের রাজ্যে।

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতাকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'মুসলমারা পালটা আন্দোলনের ডাক দিলে সামলাতে পারবেন তো?' —সত্যি সামলানো যায়নি। বলা ভালো সামলানোর চেষ্টা করেননি। যে মুর্শিদাবাদে মাত্র ৩০ শতাংশ হিন্দুর বাস, যার সিংহভাগই কংগ্রেস-তৃণমূলের সমর্থক, মুখ্যমন্ত্রী কী হালটাই না করে ছাড়লেন! শুভেন্দুবাবু তো সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন, তাকে টাইট দেওয়ার সাধ্য তাঁর এজন্মে হবে না। কিন্তু শুভেন্দুবাবুকে টাইট দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের হিন্দু সমর্থকদেরও হায়নার মুখে ছুড়ে ফেলে দিলেন। আজ মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা প্রাণ বাঁচাতে ভিটেমাটি ছেড়ে ঝাড়খণ্ডে পালাচ্ছেন। তৃণমূলের নেতা বুথ সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, সিপিএমের কট্টর সমর্থকরাও মুর্শিদাবাদ ছেড়ে মালদায় ত্রাণের খিচুড়ি খাচ্ছেন। কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতার সফল প্রয়োগ করালেন— 'দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল অন্যে কবে না কথা/বজ্র কঠিন রাজ্যশাসনে সেটাই স্বাভাবিকতা/গুলির জন্য সমস্ত রাত সমস্ত দিন খোলা/বজ্র কঠিন রাজ্যে এটাই শান্তিশৃঙ্খলা/যে মরে মরুক, অথবা জীবন কেটে যাক শোক করে— আমি আজ জয়ী, সবার জীবন দিয়েছি নরক করে।'

**মুর্শিদাবাদে যারা মেরেছে আর যারা মরছে— সকলেই বাংলাভাষায় কথা বলে। কিন্তু যারা এই বিপদে অসহায় বাঙ্গালিকে ঝাড়খণ্ডে আশ্রয় দিল তারা বাঙ্গালি নয়।**

পশ্চিমবঙ্গে ৩৩ শতাংশ মুসলমান। পাশের রাজ্য অসমে ৪০। কেরালায় ৫০। জম্মু-কাশ্মীরের ৬০ শতাংশেরও বেশি। কিন্তু ওয়াকফ বিরোধিতায় সে রাজ্যের মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গের মতো ধ্বংসাত্মক আন্দোলন করেনি। কারণ ওইসব রাজ্য সরকার দাঙ্গা চায়নি। সেজন্যই সেখানকার হিন্দুকে মরতে হয়নি, ভিন্ন রাজ্যে পালাতেও হয়নি। এখানে শাসক হিংসা চেয়েছে, তাই পুলিশ মার খেয়েছে, শাটারের পেছনে লুকিয়েছে। তাই এই আক্রমণের মাস্টারমাইন্ড কারা তার জন্য বিশেষ গবেষণার দরকার নেই।

মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে প্রাণ হারানো দুই সিপিএম সমর্থক হরগোবিন্দ ও পুত্র চন্দন দাসকে হত্যা করার আগে জেহাদিরা একবারও তাদের জিজ্ঞেস করেনি তারা কোন পার্টি করে। তাদের একমাত্র পরিচয় দেখা হয়েছিল তারা হিন্দু কিনা। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি করা সিপিএম দলের সমর্থক বলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়নি। তারা পিতা-পুত্র কিন্তু সেকুলার ছিলেন। মাটির মূর্তি তৈরি করে ভাতের লড়াইটাই এতদিন লড়ছিলেন, ধর্মটাই তাদের মরণের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই পিতা-পুত্র গত লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থীকেই ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুঃসময়ে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ-গান্ধীবাদ কোনো কিছুই তাদের

জেহাদি আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারেনি। তাদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী সেই জেহাদিদের বিরুদ্ধে তাদের দল সিপিআইএম একটি বাক্যও খরচ করেনি। এমনকী ব্রিগেডের সমাবেশে হরগোবিন্দদের ছবির পরিবর্তে ব্রিগেডের মিছিলে প্যালেস্টাইনের পতাকা কাঁধে নিয়ে বয়ে বেড়িয়েছেন তাদের সহযোদ্ধারা। স্লোগান তুলেছে 'মুসলমান বাঁচাও, বিজেপি হটাও।' কমাস আগে এরা আনিস খানের জন্য ইনসাফ সভা করেছে। কিন্তু হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর পুত্র চন্দন দাসের জন্য কোনো ইসলাম সভা হবে না, কারণ পিতা-পুত্র জাতিতে হিন্দু।

ক'মাস আগে এরা মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী যিনি ১৯৯৯ সাল থেকে মুসলমান ভোটের দৌলতে বহরমপুর লোকসভায় জিতে আসছিলেন, জীবনসায়াহ্নে এসে তাঁর বোধোদয় হয়েছে। তিনি বলেছেন— 'কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার রাজনীতি না করে মিলেমিশে ভাবুন। ওরা চাইবে এক্সটেন্ডেড বাংলাদেশ। তারা তাদের ভূগোল বাড়াতে চাইবে। মুর্শিদাবাদ দাবি করবে, মালদা দাবি করবে, দুই দিনাজপুর দাবি করবে। মুর্শিদাবাদের ৭০ শতাংশ মুসলমান। তাই তারা দাবি করতে পারে। এইসব জেলাতে বাংলাদেশের তরফ থেকে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবে। ঠুনকো রাজনীতি করলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি শেষ হয়ে যাবে। দেশ শেষ হয়ে যাবে।' আজ এতদিন পরে অধীরবাবুর একথা মনে হলো কেন? বহরমপুরের মুসলমানেরা ২০২৪ -এর লোকসভা নির্বাচনে তাদের এক জাতভাই ইউসুফ পাঠানকে বেছে নিয়ে যেই অধীরবাবুকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিল অমনি অধীরবাবুর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল, দেশপ্রেমের বন্যা বয়ে গেল। তিনি যদি ২০২৪-এ জিতে যেতেন তবে কি তার মুখ থেকে এই কথা শোনা যেত? এই দোগলা হিন্দু নেতাদের জন্যই সাধারণ হিন্দুর আজকে এই দুর্দশা।

কিছুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক মৌলানার ভাষণ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তিনি বলছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আমরা ৩১ শতাংশ মুসলমান। ৩৮৩০০ গ্রাম, ৩৫ হাজার গ্রামে ১ লক্ষ মসজিদ, হাজার হাজার মাদ্রাসা, খারিজি, এমএসকে মাদ্রাসা, সিরিয়া মাদ্রাসা, সরকারি মাদ্রাসা, তাবলিগ, ফুরফুরা, দেওবন্দি, বরেলি, বরেলি, হানিফি, শাফি, হামদ আলি, কাদেরিয়া প্রভৃতি। দলের অভাব নেই, মতের অভাব নেই। কিন্তু আজ যদি পশ্চিমবঙ্গের এই তিন কোটি মুসলমান দল ভুলে, রং ভুলে, এক কলেমার পরিচয় দিয়ে, এক রও-এর পরিচয় দিয়ে, এক নবীর পরিচয় দিয়ে, এক কিতাবের পরিচয় দিয়ে, এক ধর্মের পরিচয় দিয়ে, এক দ্বীন-এর পরিচয় দিয়ে, এক জাতির পরিচয় দিয়ে ময়দানে নামি— তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গের মাটি নয়, সারা দেশ কেঁপে উঠবে'। আচ্ছা, প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা কি এই ভাষণ শোনেনি? নিশ্চয়ই শুনেছেন।

তবে যাদের জন্য মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের এই করুণ অবস্থা সেই জেহাদিদের গ্রেপ্তার করছেন না কেন? বরং তার পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী জেহাদিদের সেফগার্ড দিতে ইমামদের সভায় ঘোষণা করলেন 'আমি হিন্দুদের কাছে অনুরোধ রাখবো আপনারা প্লিজ বুঝুন। বিজেপি ভটকাচ্ছে কিন্তু আপনারা ভটকাবেন না। আপনার সম্পত্তি যদি কেড়ে নেওয়া হতো তাহলে আপনারও গায়ে জ্বালা ধরত। ওদের গায়ে জ্বালা ধরেছে, ওরা দুঃখে আছে'। আচ্ছা যুক্তির খাতিরে যদি মেনে নেওয়া যায় ওয়াকফ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে ওয়াকফ প্রপাটি কেড়ে নেওয়া হবে তবে দোষ কার? আইন করলে মোদী সরকার করেছে। আন্দোলন হলে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত। এতে সাধারণ হিন্দুর অপরাধটা কোথায়? গ্রামের গরিব হিন্দুরা তো তাদের জমি কেড়ে নিতে যাচ্ছে না। কিন্তু এই কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী কাদের সেফগার্ড দিলেন? আরও একটা কথা, আচ্ছা কেউ দুঃখে থাকলে অন্যের বাড়ি ভাঙতে হবে কেন? অন্যের টাকাকড়ি গয়নাগাটি গোরুবাছুর লুঠ করবে কেন? আইনটা ভুল এটা বোঝা গেল, ওরা দুঃখে আছে এটাও না হয় বোঝা গেল। দুঃখে থাকলে আমি নিজের ঘরে অভুক্ত থাকতে পারি, রাগে অভিমানে নিজের ঘরের জিনিস ভেঙে ফেলতে পারি, কিন্তু নিজে দুঃখ পেয়েছি বলে অন্যের বাড়ি ভেঙে ফেলবো, পরের বাড়ি জ্বালিয়ে দেব, তাদের জীবন জীবিকা ধ্বংস করে দেব, তাদের হত্যা করে ফেলব, অন্যের মা-বোনকে রেপ করতে যাব— এটা কেমন দুঃখ? আর যে হিন্দুর সর্বনাশ হয়েছে তাকেই বুঝতে হবে যে তার সঙ্গে কেন এমন ঘটনা ঘটলো?

আসলে এত বছর ধরে হিন্দু বাঙ্গালির অনেক পাপ সঞ্চয় হয়েছে। সেই পাপের ফল ভোগ করবে না, তা কি হয়? সারদা, নারদা, টেট, এসএসসি— এত দুর্নীতি জানার পরেও এই সরকারকে আমরা জিতিয়েছি। বছরের পর বছর ক্যানিং, নলিয়াখালি-কালিয়াচক-ধুলাগড় দেখেও আমরা এই অপদার্থ দুর্নীতিগ্রস্ত জেহাদি সন্ত্রাসী সংগঠনটিকে

**যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখাতে গিয়ে হিন্দুকে প্রাণ দিতে হয়, ঘরের মাকে ১২-১৪ বছরের বিধর্মী নাবালকের কাছ থেকে ধর্ষণের প্রস্তাব পেতে হয়, কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে নিজেকে ধর্মহীন পরিচয় দেওয়া বামপন্থী পিতা-পুত্রকে কচুকাটা হতে হয়, গ্রামের পর গ্রাম, পাড়ার পর পাড়া হিন্দুকে নিজের ঘর ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়, এমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভড়ং চুলোয়ে যাক।**

ফঃ ২

জিতিয়েছি। যেদিন বারাসত থেকে হাসনাবাদ অত্যাচার নেমে এসেছিল হিন্দুর ওপরে, তখন ভেবেছিলেন ওখানে হচ্ছে, আমার এখানে তো কিছু হয়নি। ২০২১-এ বিধানসভার ফল প্রকাশের পর সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে কী অকথ্য নির্যাতন চলেছিল হিন্দু গ্রামগুলিতে। বাড়িঘর জ্বলছিল, ঘরের মেয়েদের নির্যাতন করা হচ্ছিল, হিন্দু দেখে জনে জনে হত্যা করা হচ্ছিল, সেদিন কোথায় ছিলেন হিন্দুরা? যখন সন্দেশখালিতে হিন্দু মা-বোনেদের শাজাহানের ঘরে বাধ্য হয়ে পিঠে বানাতে নিয়ে যেত তখন তার প্রতিবাদ করেছিল হিন্দুরা? না করেনি। বরং ২০২৪-এর ভোটে সেসব ভুলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে হাজার টাকা পেয়েই ভোট দিয়ে দিলেন সেই দলটিকেই। আজ বাঁচতে গেলে হিন্দুকে ভাবতে হবে কাকে নির্বাচিত করবেন? প্রশাসনিক ক্ষমতা কাকে দেবেন? সারা ভারত বিজেপিকে জিতিয়েছে। বিজেপি তাদের জন্য ভাবে। হিন্দুরা এরাজ্যে বিজেপিকে জিতিয়েছেন?

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতারা তাদের সাধ্যমতো পরিশ্রম করেছিলেন, তবুও হিন্দুরা তাদের হতাশ করেছেন। দোষ নিজেদের, যারা আমরা এই জিহাদিদের রক্ষাকর্তা সরকারকে নির্বাচনে ভোট দিয়ে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছি। আবার সুযোগ এসেছিল ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে। সন্দেশখালি প্রকাশ্যে আসার পরেও হিন্দুদের শিক্ষা হয়নি। বরং লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে পরাজয়ের পর কুলাঙ্গার হিন্দুরা রেখা পাত্রকে দু' হাজার টাকায় বুক করেছিল অনলাইনে, মনে আছে? বছরের পর বছর রামনবমীর শোভাযাত্রায় জেহাদি আক্রমণ হয়েছে, পাথরবাজি হয়েছে, কোথায় ছিল হিন্দুরা? সরকার বছরে কোটি কোটি টাকা মাদ্রাসা বোর্ডকে দিচ্ছে, সেই টাকায় দিকে দিকে অবৈধ মাদ্রাসা তৈরি হচ্ছে, মসজিদ-মিনার খাড়া হচ্ছে, তারপরেও হিন্দুদের হুঁশ ফেরেনি। হিন্দু পাড়ায় গোমাংসের দোকান হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জেহাদি আক্রমণ হচ্ছে, সিএএ-এর প্রতিবাদে হিন্দুর বাড়িঘর সরকারি সম্পত্তি জ্বলছে, নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হিন্দু পাড়ায় আক্রমণ হচ্ছে তাতেও হিন্দুরা নিশ্চুপ থেকেছে। দুর্গাপূজার কমিটিগুলি এক লক্ষ টাকা দক্ষিণা পেয়ে ভুলে গেল ফালাকাটা, গার্ডেনরিচ আর শ্যামপুরে মা দুর্গার অপমান। সেই পাপের ফলই ভুগছে আজকের মালদা, মুর্শিদাবাদ।

রাজ্যের পুলিশকর্তারা ঘটনার এক সপ্তাহ পর বলছেন যারা অপরাধ করেছে, মদত দিয়েছে, তাদের পাতাল খুঁড়ে বের করে আনা হবে, কেউ ছাড় পাবে না। পাঁচ দিন ধরে বিনা বাধায় হিন্দু পাড়ায় পাড়ায় তাণ্ডব চলল, পেট্রোল বোমা দিয়ে ঘরে আগুন দিল, তরবারির কোপে পিতা-পুত্র মারা পড়লো, জেহাদিরা হিন্দু ঘরের মেয়ে-বউ রেপ করতে দিলে দাদাদের ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিল, হিন্দুরা প্রাণ বাঁচাতে বাপ্‌ঠাকুরদার ভিটেবাড়ি ছেড়ে পাশের জেলা মালদায় আশ্রয় নিল, ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো— আর প্রশাসন হিন্দুকে বোঝাচ্ছে যে অপরাধীদের ছাড়া হবে না?

বাঙ্গালি হিন্দুদের আজ বুঝতে হবে মুর্শিদাবাদে যারা মেরেছে আর যারা মরছে— সকলেই বাংলাভাষায় কথা বলে। কিন্তু যারা এই বিপদে অসহায় বাঙ্গালিকে ঝাড়খণ্ডে আশ্রয় দিল তারা বাঙ্গালি নয়। বাঙ্গালি হিন্দুর কাছে আপন কারা? আম্মা, আব্বা, চাচা, নানা, আপা, ফুফা, গোসল, নাস্তা, দাওয়াত বলা, গোমাংস খাওয়া, হিন্দু নির্যাতনকারী তথাকথিত বাঙ্গালি, না বিহার ঝাড়খণ্ডের বিহারি- ঝাড়খণ্ডী হিন্দুরা? জাফরাবাদে হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের হত্যাকারীরা কিন্তু সিরিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশে থেকে আসেনি। তাদের প্রতিবেশী জিয়াউলই তাদের কুপিয়ে হত্যা করেছে। তাই বাঙ্গালি হিন্দুকে আজ তার প্রতিবেশীকে চিনতে হবে।

কোনো গৃহস্থের বাড়িতে যদি বিষাক্ত সাপ বাসা বেঁধে থাকে তবে গৃহস্থের করণীয় কী? তার কাছে তিনটি অপশন আছে। অপশন ১, ছোবল দেওয়ার আগেই সাপটিকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। অপশন ২, সাপটিকে মেরে ফেলতে হবে, না হলে ভবিষ্যতে ওর দংশনে গৃহস্থের মৃত্যু অবধারিত। অপশন ৩, প্রাণ বাঁচাতে গৃহস্তকে পরিবার নিয়ে ওই ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় পালাতে হবে। এছাড়া তার সামনে অন্য কোনো পথ নেই। সাপের গালে চুমু খেয়ে, তাকে প্রতিবেশী ভেবে, ভালোবাসার বিন বাজিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে সে দংশন করবেই। বাঙ্গালি হিন্দু মুর্শিদাবাদে এতদিন যে ভালোবাসার চাষ করেছে তাতে তাকে অপশন-৩ গ্রহণ করতে হয়েছে। যেদিন তারা অপশন-১ বেছে নিতে পারবে সেদিন তাকে আর নিজের ভিটেমাটি থেকে পলায়ন করতে হবে না।

মহাভারতের যুদ্ধ এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যেত যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিতেন। তিনি তা করেননি। মোহগ্রস্ত অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন এটা যুদ্ধ, ধর্ম যুদ্ধ। নিজের যুদ্ধ নিজেকেই লড়তে হবে। ঘরছাড়া বাঙ্গালিকেও আজ বুঝতে হবে তাদের হয়ে কেউ লড়াই করে দেবে না। লড়াই তাদেরকেই করতে হবে। তাদের পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, কন্যাদের সম্মান রক্ষা তাদেরকেই করতে হবে। তাই প্রয়োজনে তাদেরকে অর্জুন হতে হবে। হাতে তুলে নিতে হবে গাণ্ডীব। তাদের উপর নির্ভর করছে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। তাই নিজেদের স্বার্থে এক হতে হবে।

যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখাতে গিয়ে হিন্দুকে প্রাণ দিতে হয়, ঘরের মাকে ১২-১৪ বছরের বিধর্মী নাবালকের কাছ থেকে ধর্ষণের প্রস্তাব পেতে হয়, কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে নিজেকে ধর্মহীন পরিচয় দেওয়া বামপন্থী পিতা-পুত্রকে কচুকাটা হতে হয়, গ্রামের পর গ্রাম, পাড়ার পর পাড়া হিন্দুকে নিজের ঘর ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়, এমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভড়ং চুলোয়ে যাক। আসুন, আমরা বাঙ্গালি হিন্দুরা হিন্দু নামে এক হই। □

*With Best Compliments from -*

**A**
**Well Wisher**

# মুর্শিদাবাদ জেলা—জেহাদি প্রসারণবাদের ধারাবাহিক পরীক্ষাগার

**ড. বিনয়ভূষণ দাশ**

ওয়াকফ সংশোধন আইন, ২০২৫ আইনের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদ জেলায় আবার সম্প্রসারণবাদী জেহাদিরা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। একদা হিন্দুপ্রধান মুর্শিদাবাদ জেলায় মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ানি কেন্দ্র ঢাকা থেকে স্থানান্তরের সময় থেকেই হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের অত্যাচার ও লুটতরাজের শিকার হয়েছে। মুর্শিদকুলীর অত্যাচারের খড়্গ নেমে এসেছিল হিন্দু জমিদার চুনাখালির বৃন্দাবন রায়, রাজশাহীর উদয়নারায়ণ রায়, রাজা সীতারাম রায় প্রমুখের উপর। মুর্শিদকুলি খাঁ, সরফরাজ খাঁ, সিরাজদ্দৌউল্লা, মীরজাফর কেউই হিন্দু অত্যাচারে কম যাননি। এঁদেরই ধারাবাহিক ধর্মান্তর ও অত্যাচারের কারণ মুর্শিদাবাদ জেলা আজ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হিসেবে উঠে এসেছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপদার্থ কংগ্রেস এবং পরবর্তীকালে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত সরকারের চরম হিন্দুবিদ্বেষী বিভিন্ন পদক্ষেপ। দেশভাগ ও স্বাধীনতার সময় থেকেই জেলায় কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী নেতৃত্ব মুসলিম লিগ ও মুসলমান তোষণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে কমিউনিস্ট নেতা সুধীন সেন এক প্রকাশ্য সভায় পাকিস্তানের জয়গান গেয়েছিলেন।

সেই ধারাবাহিকতাই সমানে চলছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা হরিহরপাড়া থানার স্বরূপপুর গ্রামে ব্যাপক অত্যাচার, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেছিল। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সিপিএম নেতা জোতি বসু। পরবর্তীকালে এই জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়েই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষিত কাটরা মসজিদ দখলকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান জেহাদিদের সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় মুসলমানরা হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। তাঁরা হিন্দুদের বাড়িঘর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে হিন্দুদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যদিও এই সময়ে হিন্দুরাও জেগে ওঠে এবং জেহাদিদের পালটা আঘাত করতে সক্ষম হয়। কাশিমবাজার সংলগ্ন অঞ্চলে জেহাদিরা হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং শেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এরপর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা অনেকদিনই মোটামুটি শান্ত ছিল। যদিও ২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর থেকে জেহাদিরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। তাঁদের দৌরাত্ম্য এবারে সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাঁরা এবার শুধু মুর্শিদাবাদ জেলা নয়; সক্রিয় হয়ে ওঠে মালদহ, দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, হাওড়া, কলকাতা-সহ রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আর এ ব্যাপারে তাঁরা মমতা ব্যানার্জি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী সরকারের সম্পূর্ণ প্রশ্রয় পেয়ে যায়। রাজ্যের পুলিশ-প্রসাশন তাঁদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিতে থাকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ইঙ্গিতে। ফলে যে পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু বাঙ্গালির বসবাসের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সহ মেঘনাদ সাহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীশচন্দ্র নন্দী, বিমলচন্দ্র সিংহ, শিশিরকুমার মিত্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল সেই পশ্চিমবঙ্গেই আবার তাঁদের উদ্বাস্তু হতে হচ্ছে; জেলা থেকে পালিয়ে অন্য জেলায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে। আর যারা হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে পারবে না বলে পাকিস্তান চেয়েছিল তারা তাদের সেই তথাকথিত পবিত্র ভূমিতে না গিয়ে খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গকে তাদের জেহাদের মুক্তাঞ্চল বানিয়ে ফেলেছে বর্তমান রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতায়।

> **আজকের মুর্শিদাবাদ জেলার এই অবস্থা দেশভাগের আগের কলকাতা ও নোয়াখালির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে, ১৯৫০ সালের সময় থেকে পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে ঘটে চলা ক্রমাগত হিন্দু হত্যা এবং তাঁদের ধারাবাহিক বিতাড়ন।**

আর এই মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সাম্প্রতিক লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশের পরেও মুর্শিদাবাদ জেলা সশস্ত্র মুসলমান দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। জেলায় বেলডাঙ্গা রেলস্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আগুন লাগানো হয়েছিল ট্রেনে। কয়েকটি স্টেশনে ট্রেন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনো ট্রেনের আওয়াজে আজান দেওয়াতে অসুবিধা হয় এই অজুহাতে ধুলিয়ান, নিমতিতা, আউরঙ্গাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে স্টেশনে ভাঙচুর করা করা হয়, ট্রেন অবরোধ করা হয়।

সাম্প্রতিক হাঙ্গামা শুরু হয় মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার ঝাওবোনা ও বহরমপুর থানার দেবীদাসপুর গ্রামে। দোলের সময় জেহাদিদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়েছে এই গ্রাম দুটি। মালদহের মোথাবাড়িতে ওয়াকফ আইন বিরোধিতার অজুহাতে মুসলমানদের এই মানসিকতা আবার সামনে আসে। মনে রাখতে হবে, বেশ কয়েকটি ইসলামি দেশে ওয়াকফ আইনই নেই। কিন্তু ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশে ওয়াকফ আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু স্বার্থবাদী, কায়েমি স্বার্থের তল্পিবাহক কিছু নেতার উসকানিতে সশস্ত্র হাতিয়ার নিয়ে রে রে করে নেমে পড়েছে। অথচ, আইনটি দেশের সংবিধান

অনুযায়ী নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, রাজ্যসভা ও লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে আইনে পরিণত হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী এই আইন দেশের কেন্দ্রীয় এবং সমস্ত রাজ্য সরকার মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দেশের এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ এই আইনের বিরোধিতায় সশস্ত্র হয়ে পথে নেমেছে; তারা পাশবিক শক্তির প্রদর্শন শুরু করেছে শান্তিপ্রিয় হিন্দু নাগরিকদের উপর।

স্বাভাবিকভাবেই সশস্ত্র এই প্রদর্শনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যথোপযুক্ত, আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে এটাই কাম্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার মূক ও বধিরের ভূমিকায় শুধু নয়, কার্যত এই জেহাদিদের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর জেহাদিরা অবাধে তাঁদের ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনজন হিন্দু— যাঁদের মধ্যে একই পরিবারের পিতা-পুত্র জেহাদিদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। গত ১২ এপ্রিল সমশেরগঞ্জের জাফরাবাদ গ্রামে পিতা-পুত্র, হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর পুত্র চন্দন দাসকে হত্যা করা হয়। বাড়িতে লুটপাটে বাধা দিতে গিয়ে জেহাদিদের হাতে আক্রান্ত হন তাঁরা এবং তাঁদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যার দায়ে দুই নবাব— কালু ও দিলদার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। অথচ সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম তাঁর জাতভাইদের আড়াল করতে গিয়ে নিহতদের হিন্দু পরিচয় আড়াল করে বলেছেন, এঁরা নাকি দাঙ্গা থামাতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। কিন্তু নিহতের স্ত্রী পরিষ্কার বলেছেন, পিতা-পুত্র, হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস বাড়িতেই জেহাদিদের হাতে নিহত হয়েছেন; তাঁরা বাইরে কোনো গণ্ডগোল থামাতে যাননি। আশার কথা, হরগোবিন্দ দাসের পরিবার রাজ্য সরকারের ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা মেনে নেননি; তাঁরা রাজ্য সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করেছেন।

জানি না, এক তরফা এই হিন্দু নির্যাতনে সিপিএম নেতা— মীনাক্ষী, দিপ্সীতা, সুজন, প্রতিকুর রহমানরা কোথায়? তাঁদের মুখে সেলোটেপ কে এঁটে দিল? মীনাক্ষী অবশ্য দেখলাম সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পরে সেলিমের দোসর হয়েছিলেন। জানি না, মুর্শিদাবাদে যেসব হিন্দুকে হত্যা করা হলো, তাঁরা জাতের জন্য, নাকি ভাতের জন্য নিহত হলেন। সেলিম, মীনাক্ষী, প্রতিকুর, দিপ্সীতা কী বলেন? আর তৃণমূলিদের কথা না বলাই ভালো। কারণ শাসকের ইঙ্গিতেই দাঙ্গা বাধে, দাঙ্গা প্রলম্বিত হয়! আর এক্ষেত্রে আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ, বহিরাগত ইউসুফ পাঠান আশ্চর্যরকমে বেপাত্তা। জেলাবাসী এই দুর্দিনে তাঁর টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাননি। তিনি বরাবরের জন্য উধাও রাজ্য থেকে। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি আইপিএল নিয়ে ব্যস্ত।

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুতি, ধুলিয়ান, ঔরঙ্গাবাদ, সমশেরগঞ্জে ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার অজুহাতে জেহাদিরা হিন্দুদের উপর সশস্ত্র চড়াও হয়েছে। লুটপাট, রাহাজানি, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ইত্যাদি অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্ধ সেজে পরোক্ষভাবে এই সশস্ত্র জেহাদিদের মদত দিয়ে যাচ্ছে। ফলে অবস্থা এমন হয়েছে যে, দীর্ঘ কয়েকদিন হয়ে গেলেও জেহাদিদের এই সশস্ত্র তাণ্ডব থামছে না। ফলশ্রুতিতে ওইসব অঞ্চলের হিন্দুরা বাধ্য হয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী মালদহ জেলা বৈষ্ণবনগরের পারলালপুর হাই স্কুলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রায় চারশোটি পরিবার ওই শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। আজকের মুর্শিদাবাদ জেলার এই অবস্থা দেশভাগের আগের কলকাতা ও নোয়াখালির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে, ১৯৫০ সালের সময় থেকে পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে ঘটে চলা ক্রমাগত হিন্দু হত্যা এবং তাঁদের ধারাবাহিক বিতাড়ন।

যে কোনো অজুহাতে এই এক তরফা হিন্দু নির্যাতনের পিছনে আছে এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের কয়েকটি জেলা সম্পূর্ণ হিন্দুশূন্য করা এবং উপযুক্ত সময়ে জেলাগুলিকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার এক পরিকল্পিত চেষ্টা। সেকথা রাজ্যের কিছু পুলিশ কর্তারাও স্বীকার করে নিয়েছেন। এই হিন্দু নির্যাতনের পিছনে যে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতা-মন্ত্রি জড়িত আছেন তা মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খাঁ পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, তৃণমূলের মধ্যে কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক আছে যারা এই ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলনে গিয়ে তাণ্ডব চালাতে পারে। এমন কিছু হুলিগান পার্টিতে ঢুকে যায় যারা নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আর এই বিক্ষোভের পিছনে যে পরিকল্পিত উসকানি আছে তা পরিষ্কার। দক্ষিণ মালদহের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খাঁ চৌধুরীরও এই হিন্দুহত্যা ও বিতাড়নের পিছনে হাত আছে বলে এক সভায় মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে এই পারস্পরিক দোষারোপের পালা চলছে।

India Today পত্রিকার সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় লেখা হয়েছে, মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ আইন-বিরোধী এক সমাবেশে বেশ কিছু উসকানিমূলক বক্তব্য রাখা হয়। জঙ্গিপুরের পিডবলুডি ময়দানের ওই সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা হিন্দু বিরোধী, উসকানিমূলক বক্তব্য রাখে। এই সমাবেশের আয়োজক ছিল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন আর তা সমর্থন করে তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থা এপিডিআর, এসডিপিআই-সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা। এই হিংসায় এসডিপিআই জড়িত ছিল বলে পুলিশি তদন্তে জানা যাচ্ছে। এই সংস্থা বেশ কিছুদিন থেকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ওয়াকফের নামে মুসলমান যুবকদের উসকানি দিচ্ছিল। তাঁদের বোঝানো হয়, ওয়াকফের নামে নরেন্দ্র মোদীর সরকার মুসলমানদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেবে। তাই এই আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করতে হবে। ওই গণ্ডগোলে গুলিবিদ্ধ এক মুসলমান যুবকের আত্মীয়দের মতে, মুর্শিদাবাদে এসডিপিআই উসকানিমূলক প্রচার চালিয়েছে। অথচ, রাজ্যের গোয়েন্দাদপ্তর এসব কিছুই আগে থেকে জানতে পারেনি। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, উন্মত্ত জেহাদিদের বেশিরভাগই অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ইদের ছুটিতে বাড়িতে এসে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। এই একতরফা হিন্দুহত্যা আটকাতে রাজ্য পুলিশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। হরগোবিন্দ দাসের পরিবার রাজ্য সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণ অস্বীকার করে পুলিশের ব্যর্থতার দিকে আঙ্গুল তুলে বলেছে, পুলিশ যদি ঠিক সময়ে পৌঁছত তাহলে হয়তো অমূল্য প্রাণ দুটি বেঁচে যেত। সেখানকার হিন্দুরা ওইসব এলাকায় স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প চাইছেন।

একথা বলা যায়, মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য কয়েকটি জেলায় এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে যদি না হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়, যদি রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন সক্রিয় না হয়। এবং সর্বোপরি ওই জেলাগুলিতে জনবিন্যাস পরিবর্তন না করা যায়! জনবিন্যাস কী করে পরিবর্তন করা যায় সে সম্পর্কে দায়িত্বশীল কোনো সরকারকেই ভাবতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

# ওয়াকফ সংশোধনী আইন ছিল সময়ের দাবি

**ধর্মানন্দ দেব**

ওয়াকফ শব্দটি আরবি মূল শব্দ 'ওয়াকফা' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'নিষেধ করা' বা 'বন্ধ করা'। কোনো মুসলমান ব্যক্তি যদি তাঁর নিজস্ব স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয়, দানমূলক বা জনহিতকর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন, তাহলে সেই সম্পত্তিকে 'ওয়াকফ' হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সম্পত্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্য সাধারণত মজহবি কর্মকাণ্ড, সমাজসেবামূলক উদ্যোগ কিংবা দান-খয়রাতের জন্য নির্ধারিত হয়। যদিও কে এই সম্পত্তি ভোগ করবেন, তা সব সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে না, তবুও মজহবি অনুষঙ্গ থাকা আবশ্যক।

'প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের ইতিহাসে ওয়াকফের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দিল্লির সুলতানি শাসনের প্রথম দিকে। জামা মসজিদ কর্তৃপক্ষকে দুটি গ্রাম উৎসর্গ করেছিলেন সুলতান মুইজুদ্দিন বিন সাম ঘোর মুলতান বা মহমুদ ঘোরি। ওয়াকফ হিসেবে ওই গ্রাম দুটি মসজিদের তৎকালীন প্রশাসন শাইখুল ইসলামের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটিই ভারতের প্রথম ওয়াকফ বলে মনে করা হয়।

ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে, ১৯১৩ সাল থেকে ভারতে ওয়াকফ পরিচালনার জন্য একটি আইনি ব্যবস্থা রয়েছে, যখন মুসলিম ওয়াকফ বৈধকরণ আইন কার্যকর হয়। এরপর ১৯৫৪ সালে ওয়াকফ আইন প্রণয়ন করা হয়, যা শেষ পর্যন্ত ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ২০১৩ সালে, আইনটি সংশোধন করে ওয়াকফ সম্পত্তি দখলের জন্য দু' বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছিল এবং ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রয়, উপহার, বিনিময়, বন্ধক বা হস্তান্তর স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

এছাড়াও বছরের পর বছর ধরে ওয়াকফ সংক্রান্ত বিরোধ দেশে বাড়তে থাকে। ওয়াকফ আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা এবং স্বচ্ছতার অভাবে জমি দখল, অব্যবস্থাপনা, মালিকানা বিরোধ, নিবন্ধন ও জরিপের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে জনমানসে। এই মুহূর্তে ওয়াকফ বোর্ডের দখলে সারা দেশে ৮.৭ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি রয়েছে যা ৯.৪ লক্ষ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত। ভারতীয় রেল ও সেনার পর সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি রয়েছে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্য অনুযায়ী, ১৯১৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সমস্ত ওয়াকফ বোর্ডের মোট জমি ছিল ১৮ লক্ষ একর। তবে ১০১৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ২১ লক্ষ একর জমি যুক্ত হয়েছে।

২০২৫ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত, ভারতে প্রায় ৩৯ লক্ষ একরেরও বেশি জমি জুড়ে প্রায় ৮,৭২,০০০ নিবন্ধিত ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। এর মধ্য ৪,০২,০০০-এরও বেশি সম্পত্তি 'ব্যবহারকারীর দ্বারা ওয়াকফ' হিসেবে তালিকাভুক্ত, যার অর্থ হলো আনুষ্ঠানিক নিবন্ধনের পরিবর্তে ঐতিহ্যবাহী ব্যবহারের ভিত্তিতে সম্পত্তিও চিহ্নিত করা হয়েছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে মাত্র ৯,২৭৯টি মামলায় মালিকানার নথি আপলোড করা হয়েছে এবং মাত্র ১,০৮৩টি সম্পত্তির ওয়াকফ দলিল রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে, সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা সর্বাধিক, প্রায় ২,১৭,০০০। যদিও জমির

সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না, তবে এটি সংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম ওয়াকফ সম্পত্তির খতিয়ান। পশ্চিমবঙ্গে ৮০,৪৮০টি সম্পত্তি, পঞ্জাবে ৭৫,৯৬৫টি, তামিলনাড়ুতে ৬৬,০৯২টি এবং কর্ণাটকে ৬২,৮৩০টি ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। WAMSI (ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডিয়া)পোর্টালের তথ্য অনুসারে, অসমে প্রায় ২,৬৫৪টি সম্পত্তি রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালগুলিতে প্রায় ৪০,৯৫১টি মামলা বিচারাধীন, যা এই ব্যবস্থার জটিলতা ও অকার্যকারিতাকে প্রকাশ্যে তুলে ধরে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের রায়গুলির উপর দেশজুড়ে কার্যকর আইনি ব্যবস্থায় তদারকি নেই, ফলে সঠিক বিচার প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হচ্ছে। ২০১৩ সালের পর থেকে ওয়াকফ আইন জনসাধারণ ও মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্তরের নজরে এসেছে। মুসলমান বুদ্ধিজীবী, মহিলা, বোহরা সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অনগ্রসর মুসলমান গোষ্ঠী ওয়াকফ বোর্ড ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেছেন। আপিল প্রক্রিয়াতেও রয়েছে মারাত্মক ত্রুটি। বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার ব্যবস্থা থাকলেও, সেই আপিল নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার অভাব মামলাগুলিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখছে। এই বিলম্বিত বিচার পদ্ধতি ন্যায়বিচারের মৌলিক অধিকারকে ব্যাহত করে।

২০২৫ সালের ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন কার্যকর হওয়ার আগে, বিদ্যমান ওয়াকফ আইনের ৪০ নম্বর ধারার অধীনে কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণার একচেটিয়া অধিকার ওয়াকফ বোর্ডের হাতেই ন্যস্ত ছিল। এই ধারা অনেক সময় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, কারণ বহু ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে যে ওয়াকফ বোর্ড নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে— গরিব মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তিও কখনো কখনো জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করে 'ওয়াকফ' ঘোষণা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বোর্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত নিরপেক্ষ ও ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনীটি আনা জরুরি হয়ে পড়েছিল দেশের আইন প্রণেতাদের কাছে।

২০২৫ সালের ওয়াকফ আইন সংশোধনের আগে ওয়াকফের দখল করা জমি বা সম্পত্তিতে কোনোভাবেই পর্যালোচনা করার সুযোগ ছিল না। এমনকী কারও আপত্তি সত্ত্বেও জমি বা সম্পত্তি দখল করতে পারে ওয়াকফ বোর্ড। ওয়াকফ সম্পত্তির সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে বলা যায় দেশের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী। বঞ্চিত হয়েছেন সাধারণ মুসলমানরা। নতুন আইন কার্যকর হওয়ার ফলে সাধারণ মুসলমানরা উপকৃত হবেন। তাছাড়া সাচার কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছিল ওয়াকফ নিয়মের সংস্কারের প্রয়োজন। তাই ওয়াকফ আইন সংশোধন ছিল সময়ের দাবি।

তাই বর্তমান সংশোধনী আইন ২০২৫-এর মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, ওয়াকফ ডিজিটাল নথিভুক্তি ও অডিট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, অন্যদিকে মজহবের নাম করে অন্যের জমি দখলের প্রবণতারও অবসান ঘটানো হয়েছে। বিশেষ করে, আইনের নতুন ধারা ৩ (3E)-তে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তফশিলি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল— যা সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফশিলিভুক্ত— সেখানে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা নিষিদ্ধ। অসম রাজ্য, যার ৮টি জেলা ষষ্ঠ তফশিলভুক্ত, এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের আবেদন দাখিল করে সংসদের পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছে। এর পাশাপাশি রাজস্থান, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র রাজ্যগুলিও একই রকম আবেদন দাখিল করেছে।

অপরদিকে, ভারতীয় সংসদ এই সংশোধনী আইনটি প্রণয়নের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, মজহবি রীতি ও বিশ্বাসের নামে অন্যের মালিকানাধীন জমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করা যাবে না। সংবিধানের সেকুলার চেতনা অনুযায়ী কোনো মজহবি প্রতিষ্ঠানকে এমন অবারিত ক্ষমতা দেওয়া যায় না, যাতে তারা ব্যক্তিগত বা সরকারি জমিকে নিজেদের সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারে। ওয়াকফ আইন, ১৯৫৪ এবং ১৯৯৫— মূলত সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী ছিল, যা ২০২৫-এর সংশোধনীর মাধ্যমে শোধন বা সংস্কার করা হয়েছে। এটি এখন একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সংবিধানসম্মত কাঠামো পেয়েছে।

এই সংশোধনী আইনটি মুসলমান সমাজের মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকেও একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা ও এতিম মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তা বরাদ্দ করা হবে। 'ওয়াকফ আল-আল-আউলাদ' প্রথার অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দাবিগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, দীর্ঘদিন ধরে মহিলারা যেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তা ফিরিয়ে আনার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড ও কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলে দু'জন করে মহিলা সদস্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে তারা নীতিনির্ধারণী স্তরে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। পাশাপাশি বোর্ডে অমুসলমান সদস্য রাখারও প্রস্তাব রাখা হয়েছে— এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ। এর ফলে বোর্ডের কাজকর্মে বৈচিত্র্য, সহনশীলতা এবং আইনি ভারসাম্য তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সংসদে বলেছেন, বিভিন্ন রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড যেহেতু অমুসলমানদের জমি 'ওয়াকফ' হিসেবে দাবি করছে, সেহেতু সেইসব জমিজমা সংক্রান্ত শুনানিও একতরফা হতে পারে না। ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলমান সদস্যের অন্তর্ভুক্তি আনতে পারে আইনি ভারসাম্য।

এই আইনের আওতায় কেন্দ্রীয় একটি ওয়াকফ পোর্টাল তৈরি হবে, যেখানে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির নথি ও ব্যবস্থাপনার তথ্য থাকবে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বা প্রশাসন সহজেই দেখতে পারবে কোন সম্পত্তি কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার মালিকানা কী এবং সেই সম্পত্তি থেকে হওয়া আয় কোথায় ব্যয় হচ্ছে। এটি দুর্নীতি রোধে এক কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই আইন স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে যে, মজহবি আচ্ছাদনে কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষেও দেশের আইন ও সংবিধানের ঊর্ধ্বে যাওয়া সম্ভব নয়। ওয়াকফ বোর্ডের আগের স্বেচ্ছাচারী আচরণে যেমন জমির জবরদখল, বৈষম্যমূলক ব্যবহার, নারী ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বঞ্চনা দেখা গিয়েছিল, তেমনি এখন নতুন আইনের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫ শুধুমাত্র মুসলমান সমাজ নয়, বরং সমগ্র দেশের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলবে। এই আইন সংবিধানের মৌলিক চেতনা— সর্বপন্থসমভাব সমতা, ব্যক্তি-অধিকার ও সুশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতের একটি দায়িত্বশীল, কল্যাণমুখী ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সহায়ক হবে।

***(লেখক পেশায় আইনজীবী)***

# হিংসার উৎকট উৎসবে ত্রস্ত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা

**মণীন্দ্রনাথ সাহা**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের ৬৪তম কবিতায় লিখেছেন—

‘হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।’

হিংসায়, হানাহানিতে, রক্তস্নাত, নগ্ন-নির্লজ্জ মিথ্যাচারিতার এমন দিনলিপি, যার পাতায় পাতায় রয়েছে রক্তের ছোপ, বুলেটের দাগ, মাথা থেকে ছিটকে বেরনো ঘিলু আর ধর্ষণের উৎকট উল্লাসের পশ্চিমবঙ্গ। এটাই আমাদের স্বদেশ। এটাই আমাদের শ্মশান। এই মৃত্যুময় অলিগলি, নদীখাত, টিউবওয়েলের জলে রক্তমোছা পিচ, পুকুরের জলে ঢেলে দিচ্ছে বিষ, অগ্নিসংযোগে, প্রহারে, নির্যাতনে, ধর্ষণে, গৃহহারা, সর্বহারা হিন্দু সমাজ আজ দিশেহারা।

একটু পিছন ফিরে দেখে নেওয়া যাক। সরকারি মদতে হিংসার শুরু হয়েছিল সেই ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ থেকে। বর্ধমান শহরের প্রতাপেশ্বর শিবতলা অঞ্চলের সাঁইবাড়িতে। সেদিন সিপিএমের বীরপুঙ্গবরা দলবদ্ধ হয়ে সাঁইবাড়িতে ঢুকে আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করেছিল মলয় সাঁই, প্রণব সাঁই এবং তাঁদের বন্ধু তথা গৃহশিক্ষক জীতেন রায়কে। নবকুমার সাঁই, তাঁর বৃদ্ধা মা, ছোটো দুই ভাই— উদয় ও বিজয় সাঁই, কংগ্রেস কর্মী অমল যশ, সুশীল পাল, প্রিয়রঞ্জন মল্লিক, মধু মণ্ডল সকলেই গুরুতর আহত হয়েছিলেন। সিপিএমের আগুনখেকো নেতারা সেদিন পৈশাচিক উল্লাসে মলয় আর প্রণবের রক্ত মা মৃগনয়না দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দেওয়ার পর ছেলেদের রক্তে মাখা ভাত জোর করে খাইয়েছিল মাতা মৃগনয়নাদেবীকে। পরবর্তীতে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মহান জ্যোতি বসু বলেছিলেন— ‘সাঁই মেরেছি বেশ করেছি।’

*মুর্শিদাবাদের ঘরছাড়াদের শিবিরে রাজ্যপাল।*

সাঁইবাড়ির পর ১৯৭১-এর আগস্ট মাসে কাশীপুর বরানগরে ১৪ বছরের অষ্টবসু, ১৩ বছরের সমীর বড়াল, ১৪ বছরের মালয়, ১৬ বছরের নমিতা দে, ১৭ বছরের পঞ্চানন রায়, ১৬ বছরের শ্যামসুন্দর মাইতির মতো কিশোর-সহ আরও অনেকের জীবনদীপ নিভেছিল।

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সংখ্যার ‘ফ্রন্টিয়ার’-এ লেখা হয়েছিল— ‘শুক্র ও শনিবার এই দু’দিনের মধ্যে ১৫০ জনেরও বেশি তরুণকে খুন করা হয়। অন্যরা যাঁরা তরুণ নন, তাঁদেরও মরতে হয়।’

এরপর এল ১৯৭৯ সালের ১৭ মে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ বাহিনীর বন্দুক থেকে অঝোরে অগ্নিবৃষ্টি ঝরেছিল আর সিপিএমের ক্যাডারদের ড্যাগার ছিন্নভিন্ন করেছিল পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু উদ্বাস্তুদের শরীর এই পশ্চিমবঙ্গের মরিচঝাঁপি দ্বীপে। সেদিন যে কত হিন্দুর মৃতদেহ কুমিরের পেটে গিয়েছিল, আর কত মৃতদেহ অভয়ারণ্যে বাঘেদের খাদ্য হিসেবে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক হিসেব মেলেনি। কোনো তথ্যে উঠে এসেছে ১২-১৫ হাজার, কোনো তথ্যে ১০ হাজারের বেশি। সরকার বলেছিল মাত্র ২ জন। যাঁরা অনেক কষ্ট সহ্য করে দেশের মাটিতে এক টুকরো বাসযোগ্য পৃথিবী রচনা করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা কেউ আর থাকলেন না। বাঙ্গালি সরকার, বামফ্রন্টের সরকার— তাদের হৃদয়হীনতা ও ক্ষমতাগর্বে সেই দুর্গম দ্বীপভূমি উদ্বাস্তুশূন্য করে ফেলল।

দেশভাগ ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পাপ। আর মরিচঝাঁপি পশ্চিমবঙ্গে বামশাসনের আদিম পাপ। শোনা যায়— সেই ফাঁকা মরিচঝাঁপি দ্বীপে এখন নাকি মায়নামার থেকে আগত উচ্চফলনশীল প্রজাতির রোহিঙ্গা চাষ চলছে পুরোদমে রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে।

১৯৭৯-এর পর ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল। মহানগরী কলকাতা শহরের কসবার বিজন সেতুর ওপর আক্রমণ হানা হয়েছিল আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের ওপর। সেই আক্রমণে কয়েকজন বেঁচে গেলেও বাঁচেননি ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী-

## শোকবার্তা

জম্মু ও কাশ্মীরের পাহেলগামে পর্যটকদের উপর নৃশংস সন্ত্রাসী হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দুঃখজনক। আমরা এই ঘটনায় নিহত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

এ হামলা দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে আঘাত করার অপচেষ্টা। সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের উচিত সকল মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে এর নিন্দা করা। সরকারের উচিত সকল ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এই হামলায় দোষীদের শাস্তির জন্য অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া।

**শ্রী দত্তাত্রেয় হোসবলে**
সরকার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

সন্ন্যাসীনিরা। প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল রাস্তায় ট্যাক্সি থেকে টেনে নামিয়ে লাঠি, রড দিয়ে পিটিয়ে, ছোরা দিয়ে খুঁচিয়ে, গায়ে অ্যাসিড ছিটিয়ে তারপর পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল কমিউনিস্ট নামক অসভ্য-বর্বর রাজনীতিকেরা। আক্রান্ত হয়েও প্রাণে বেঁচেছিলেন ১৮ জন। সেদিনের ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছিল, তারা হলেন শচীন সেন (সিপিএমের বিধায়ক), কান্তি গাঙ্গুলি (পরবর্তীকালে সিপিএমের মন্ত্রী), স্বপন (বাবলু) চক্রবর্তী, গুরুপদ বাগচি, চিন্ময় হাজরা প্রভৃতি সিপিএমের বড়ো বা মাঝারি নেতা।

আবার ফিরে এল অভিশপ্ত ১৯৯০-এর ৩০ মে। গোসাবা- রাঙাবেলিয়া থেকে একটা ট্যাক্সি বানতলা-তিলজলা রোড ধরে ছুটে আসছিল কলকাতার দিকে। গাড়িতে তিনজন মহিলা আরোহী--- রেণু ঘোষ, অনিতা দেওয়ান ও উমা ঘোষ। রেণু ইউনিসেফের (UNICEF) দিল্লি অফিসের আধিকারিক। বাকি দু'জন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিবার কল্যণ শাখার কর্মী। গাড়ির ড্রাইভার অবনী নাইয়ার।

বানতলা সড়কে দশ-বারোজন যুবক গাড়ি থামিয়ে মুখে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে অনিতা, রেণু, উমাকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে প্রায় ৫০০ মিটার টেনে নিয়ে গেল খোলা মাঠে। সন্ধ্যার ঘণীভূত অন্ধকারে তিনজন নারীকে বিবস্ত্র করে হার্মাদরা পৈশাচিক উল্লাসে ধর্ষণ করেছিল একের পর এক। রাত এগারোটার পর পুলিশ সম্পূর্ণ নিরাবরণ তিনটি নারীদেহ নিয়ে এল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সিতে। মহিলা ডাক্তার মৃতা নারীর যোনির দিকে তাকিয়ে 'ও'! মাগো!' বলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। দেখা গেল মৃতার যোনিপথে তিন ব্যাটারির একটি ধাতব টর্চ লাইট ঢোকানো রয়েছে। অবনী বাধা দিয়েছিল সেজন্য তার জন্য পুরুষাঙ্গ থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। ২ জুন ১৯৯০ সালে ঘটনাটি সংবাদপত্রে প্রকাশ হলে তিনজন মহিলা ও ড্রাইভারের মৃত্যু সম্পর্কে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে মহান জ্যোতি বসু বলেছিলেন— 'এরকম তো কতই হয়।'

এরপর ১৯৯৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ধর্মতলা, সূচপুর, ছোটো আঙারিয়া, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বাসন্তী, নেতাই প্রভৃতি স্থানে রাজ্যবাসীর ওপর মহান জ্যোতি বসু এবং সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারি দমন-পীড়ন অব্যাহত ছিল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন ঘোষণা করেছিলেন, বদলা নয়, বদল চাই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডিজে নয়, রবীন্দ্র সংগীত বাজবে। সেদিন তাই বেজেছিল। বাঙ্গালির মননে এক নতুন প্রভাত উঁকি দিয়েছিল। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ৩৪ বছরের বাম শাসনের নির্মম অত্যাচারের পরিসমাপ্তির পর এক নতুন আলোকবর্তিকায় সকলের চোখে মুখে আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকেই আশা করেছিল এবার ঠিক রাজ্যে শান্তি ফিরবে। কিন্তু তারপর যতদিন যাচ্ছে, সবকিছু কেমন যেন পালটে যাচ্ছে। বাঙ্গালির মনে সে আনন্দ আর নেই। কিছুদিনের মধ্যেই সেই সিপিএমের কায়দায় শুরু হলো তৃণমূলের গুন্ডাদের দ্বারা (মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় দুধেল গাই) হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ক্যানিঙের নলিয়াখালি- গলাডহড়া দিয়ে। হতে লাগল হিন্দু নারীদের ওপর নির্যাতন, ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যা। পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, নৈহাটি, নদীয়া, মালদহ, দুই দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ, কুশমণ্ডি, হরিরামপুর, বংশীহারি, কুমারগঞ্জ-সহ রাজ্যের আরও বিভিন্ন জায়গায়। দু' একটা জায়গা ছাড়া সর্বত্রই দুধেল গাইদের দ্বারা অপকর্ম সংগঠিত হচ্ছে। আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় এক ডাক্তারি ছাত্রী নৃশংসভাবে হত্যা হলো। বাঙ্গালি রাতের পর রাত জেগে সারাবিশ্বে আন্দোলন ছড়িয়ে দিল। কিন্তু আজও প্রকৃত দেষীরা শাস্তি পেল না। তারা নাকি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এছাড়া প্রতিটি ভোটের আগে পরে সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে তাদের গৃহহারা, গ্রামছাড়া, রাজ্যছাড়া করা হয়েছে। ২০১১-র বিধানসভা ভোটের আগে-পরে, ২০৩৪-এর লোকসভা ভোটের আগে-পরে, পঞ্চায়েত ভোটের আগে-পরে নিয়ম করে কয়েক 'শ হিন্দুকে হত্যা করেছে শাসকদলের গুন্ডারা। তাছাড়া নিয়ম করে শুরু হয়েছে প্রতিবছর হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধাদান, হুমকি ও ভাঙচুর। গত বছরের দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, কার্তিক পূজা, রাস পূর্ণিমাতে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ চলেছে। আর ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মালদহের মোথাবাড়িতে এবং তারপর মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করে তৃণমূলের দুধেল গাইরা। কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিএসএফ ও পুলিশের ত্রিফলা নজরদারিতে নতুন করে হিংসা না ছড়ালেও এখনো থমথমে সামসেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান, রামনগর প্রভৃতি এলাকা। চারিদেকে শুধুই হাহাকার, মানুষ শূন্য গ্রামের পর গ্রাম। ইতস্তত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু গবাদি পশু। আর পশ্চিমবঙ্গের নতুন বছরের প্রথমেই ভিটেমাটিছাড়া পরিবারগুলির দিন কাটছে মালদহের পারলালপুরের অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে। তবুও সবাই চুপ। চুপ রয়েছে রাজ্যের বিরোধী দল সিপিএম, কংগ্রেস এবং সুশীল সমাজ। যারা হাথরাস, মণিপুর নিয়ে কান্নাকাটিতে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিল তারা এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আর কতদিন এভাবে চলবে? আর এইসব হিংসা নিয়ে মনে পড়ে রবিঠাকুরের কবিতার কিছু অংশ—

'রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর জলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে;
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে।'

## হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালি কি আবার তার নিজের জাতিসত্তা, ধর্মীয় পরিচয় খোয়াতে চলেছে? গত ১ সপ্তাহ ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে মুসলমানরা আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসের মাধ্যমে লুটপাট অগ্নিসংযোগ বাড়ি, দোকান ভাঙচুর ও হত্যা চালাচ্ছে তা কি সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না? হিন্দু মহাসভা মনে করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভার কয়েকজন মন্ত্রীর বেলাগাম উসকানিমূলক ভাষণের ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গে এই সন্ত্রাসের রমরমা।

হিন্দুমহাসভা মনে করছে রাজ্য সরকারের মদতে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় জেহাদিরা শুধু বেছে বেছে হিন্দু সমাজের মানুষদের উপর আক্রমণ করছে। যেভাবে হিন্দুদের উপর এবং তাদের সম্পত্তিগুলি ধ্বংস করছে তার জন্য রাজ্য সরকার ও পুলিশের ভূমিকা খুব নিন্দনীয়। আমরা এই ঘটনায় সুরাবর্দির পাঠান-পুলিশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের অনকটাই মিল দেখতে পাচ্ছি। হিন্দু মহাসভা এই মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের তীব্র ধিক্কার জানায়। হিন্দু মহাসভা মনে করে মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূলের মুসলমান নেতাদের ৭০ শতাংশ ও ৩০ শতাংশ হিসাবেরই হুমকিরই প্রতিফলনই হলো এই সন্ত্রাস।

হিন্দু মহাসভা সরকারের কাছে এই দাবি করে যে, সমস্ত হিন্দু পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হিন্দু মহাসভা এই ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করে এবং রাজ্যপালের নীরব ভূমিকার ও তীব্র প্রতিবাদ করছে। এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়।

—**অপূর্ব মণ্ডল,**
বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। কলকাতা-১২।

## স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যা সংরক্ষণযোগ্য

'স্বস্তিকা'র নববর্ষ ১৪৩১ বিশেষ সংখ্যা অবশ্যই সংরক্ষণ ও বহুধা প্রচারের উপযুক্ত সংখ্যা। সম্পাদক ড. তিলকরঞ্জন বেরাকে বিশেষ অভিনন্দন তাঁর ওই সংখ্যায় অতি সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত ভাষা ও চিন্তার প্রয়োগ ঘটানোয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন ভেতরে কী অমূল্য সম্পদ আছে! এছাড়া পুরানো দিনের বিগত কার্যকর্তা, যথা বংশীলাল সোনী, সুনীলবরণ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস বসু প্রমুখ অভিজ্ঞ পুরোধা পুরুষদের বহু কৃচ্ছসাধন করা উপলব্ধ তথ্য যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তা যে কোনো দেশভক্ত ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত ও প্রবুদ্ধ করবে। এই সংখ্যায় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের যে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যেটা সকলেরই জানা প্রয়োজন।

আর একটি অনুরোধ, আগামী যে দুটি সংখ্যায় গয়েশপুরের মাঠ থেকে প্রেরণা পেয়ে যে সব নতুন স্বয়ংসেবক প্রচারক, বিস্তারক ও কার্যকর্তা হিসেবে মূল্যবান অবদান রেখেছেন, তাঁদের কথা সামান্য হলেও তুলে ধরা। শিক্ষক সংগঠনে ড. অজিত ব্যানার্জি, অজিত বিশ্বাস; কৃষক সংগঠনে অজিত বারিক, প্রচারক শ্রীকান্ত নন্দী প্রভৃতি ব্যক্তির অবদান অবশ্যই উল্লেখ্য। তখন সঙ্ঘ কাজের অনুকূল পরিবেশ আদৌ ছিল না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন উপেক্ষা করে যেভাবে তাঁরা সঙ্ঘকাজ বিস্তারে অবদান রেখেছিলেন, তা আজ অবশ্যই স্মরণীয়। এসবের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজের অবশ্যই বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। এখন একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে যেনতেনপ্রকারেণ সঙ্ঘের নামে সঙ্গে জুড়ে থাকা, তা রাজনৈতিক ফায়দা লোটা বা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। তারা ভাবে সঙ্ঘের সঙ্গে যে কোনোভাবে যুক্ত থাকলে নানা সুবিধা পাওয়া যাবে। এরা সঙ্ঘকে ভালোবাসে না, সঙ্ঘের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নয়। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। এ বিষয়ে সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। তা না হলে একটা পচা আলু সমগ্র আলুর বস্তাটাতেই পচন ধরিয়ে দিতে পারে। আগে অগ্নিপরীক্ষা, পরে গ্রহণ করা।

অতীতে আমরা সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে দেখেছি, প্রশিক্ষক যাঁরা থাকতেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন পদ্ধতি দেখে আমরা শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হতাম; যথা কেশবরাও দীক্ষিত, অনন্তলাল সোনী, শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বাঁকুড়া জেলার রামসাগরে প্রথম বর্ষ শিক্ষা বর্গ চলছে। দুপুরে ভোজনের কিঞ্চিৎ পরে মঞ্চে বৌদ্ধিক চলছে। বাইরে দর্শকাসনে বহু দর্শক। শ্রোতার মাঝখানে অনন্তলাল সোনী বসে শুনছেন। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। যে যার মাথা বাঁচানোর জন্য সরে পড়ল। অনন্তদা কিন্তু কাঁধের তোয়ালেটি মাথায় দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে পুরো বৌদ্ধিক শুনলেন। যারা মাথা বাঁচানোর জন্য ছুটে সরে পড়েছিলেন তাদের লজ্জায় মাথা কাটা গেল। কাটোয়ায় ১ম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে কেশবজী কাপড়চোপড় কাচছেন দেখে আমি তাঁর হাতের কাজ নিয়ে নিতে চাইলে তিনি বললেন, 'এটাই তো সঙ্ঘের শিক্ষা— নিজের কাজ নিজে করা— তা সে যে কোনো কাজই হোক।' এই বলে তিনি নিজে জামাকাপড় কাচতে লাগলেন। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভালো, এগুলো সঙ্ঘে বহুবার দেখেছি বলেই আজ বিরাশি বছর পেরিয়েও সঙ্ঘের আদর্শ বয়ে বেড়াচ্ছি। যদি আমরা স্বয়ংসেবক নির্বাচনে ও নির্মাণে সতর্ক না হই, কে সাধু আর কে ছদ্মবেশী সাধু তা যদি নির্ধারণ করতে শৈথিল্য দেখাই, তা হলে দুধপুকুর না হয়ে জলপুকুর হতে বেশি সময় লাগবে না। তাই সাবধান। এগুলো কোনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি না। সঙ্ঘকে যথেষ্ট ভালোবাসি বলেই আত্মসমালোচনা করছি। ধৃষ্টতা হয়ে থাকলে ক্ষমা প্রার্থী।

—**নিমাই কুমার মুখার্জী,**
কলেজ রোড, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

# বর্তমান সময়ে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘকে এগিয়ে আসতে হবে

রাজ্যের সংগঠিত ও অসংগঠিত সমস্ত ক্ষেত্রেই শ্রমিকরাই আজ অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ঠিকা শ্রমিকদের দুরবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূল নিয়োগকর্তা এবং ঠিকাদার ও নেতৃত্বের একটা বড়ো অংশের যৌথ যোগসাজশের কারণে সাধারণ শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কেন্দ্রের রাষ্ট্রবাদী সরকারের শ্রমমন্ত্রক অসংগঠিত ঠিকা শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা সত্ত্বেও অসংগঠিত ঠিকা শ্রমিকরা সেই মজুরি পাচ্ছেন না। এই মজুরির একটা বড়ো অংশ উপরোক্ত তিনজনের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাগ বাঁটোয়ারা হচ্ছে এবং এই সম্ভাবনা প্রবল। অসংগঠিত ঠিকা শ্রমিকদের ২৬ দিনের ন্যূনতম মজুরি, তাদের ইপিএফ, তাদের ইএসআই, গ্র্যাচুইটি, বোনাস-সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে অসঙ্গতি চোখে পড়ছে। এর ফলে অসংগঠিত ঠিকা শ্রমিকদের একটা বড়ো অংশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

এটা দেখবার জন্য ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘকে আরেকটু বেশি অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলাতে তেমন কোনো শিল্প না থাকলেও কল্যাণী এইমস এবং পেট্রাপোল এলইপিতে ঠিকাদারের অধীনে অনেক কর্মী কাজ করেন। তাঁরা তাদের সঠিক প্রাপ্য পাচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘকে আরও একটু বেশি দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি অসংগঠিত ক্ষেত্র যেমন রাজমিস্ত্রি, বিড়ি শ্রমিক, চিরুনি শ্রমিক, লরি এবং বাস-সহ বিভিন্ন শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রকের বরাদ্দ এবং শ্রমিককল্যাণকামী সুবিধাগুলো ঠিকমতো পাচ্ছেন কিনা সেটাও দেখা প্রয়োজন। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বরাবরই উপেক্ষিত এবং বঞ্চিত। এই উপেক্ষিত বঞ্চিত মানুষদের রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রকের শ্রমিক কল্যাণকারী প্রকল্পগুলিকে তাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য এবং সেই সুবিধাগুলি তাদেরকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ একটা বড়ো আশ্রয়। এই আশ্রয়কে সামনে রেখে শ্রমিকের স্বার্থে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘকে আরও বেশি বেশি করে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া বর্তমানে একটি দায়িত্ব এবং কর্তব্য হয়ে উঠেছে। আশা রাখি, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ সংগঠনকে ঢেলে সাজিয়ে তাদের আন্তরিকতার সঙ্গে অসংগঠিত ঠিকা শ্রমিকদের দুর্দশা কাটাতে এগিয়ে আসবে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেড রোড, খয়রামারি বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

# পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কী হবে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যটাকে এক অন্ধকার, বর্বরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। একদিকে এসএসসির দুর্নীতি। যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের লাঠিপেটা, তাঁদের লাথি মারার ভয়ংকর, পৈশাচিক দৃশ্য চোখে জল আনে। অন্যদিকে ওয়াকফ সংশোধন বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে নিরীহ হিন্দুদের উপর জেহাদিদের বর্বরতা রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। স্বদেশে তারা পরবাসী হয়ে গেছে। বহু হিন্দু প্রাণ ভয়ে বাড়িছাড়া হয়েছেন। নেতা-নেত্রী বুদ্ধিজীবী সবাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। তাঁরা সময় বুঝে মুখ খোলেন, মুখ বন্ধ করেন। দেশের সার্বভৌমত্বের উপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। জাতীয় সংহতি আজ বিপন্নতার মুখে। মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের জন্ম ভুলিয়ে দিতে পয়লা বৈশাখ রাজ্যের জন্মদিন পালন করছেন। জন্ম দিন জন্ম দিনে পালিত হয়। তিনি ইতিহাসের উলটো পথে হাঁটতে শুরু করছেন। তাঁর নিজের জন্মদিন ঠিক নেই তিনি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন। এভাবে নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলছেন। তাঁর রঙ্গ তামাশা দেখে রাজবাসী লজ্জা পায়। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, প্রজার কষ্ট। রাজ্যবাসী আজ নিদারুণ দুঃখে কষ্টের মধ্যে আছে। শিল্প নেই, কলকারখানা, চাকরি নেই। চারদিকে শুধু হাহুতাশ, হাহাকার। এক দারুণ দুঃসময়ের মধ্যে চলছে পশ্চিমবঙ্গ। দেখে মনে হচ্ছে অযোগ্যদের দ্বারা যোগ্যদের শোষিত ও শাসিত হাওয়াই আমাদের গণতন্ত্র।

কেন্দ্র এখনো চুপ মেরে আছে। এমন উত্তপ্ত সময়ে কারও আনন্দে মেতে থাকা ঠিক নয়। ব্যক্তিগত পরিসরে না ঢোকাই ভালো। কারোর সর্বনাশ কারোর পৌষমাস। কিন্তু নেতা-নেত্রীদের চিরকাল পৌষমাস বলে মনে হয়। মাঝখানে ওয়াকফ নিয়ে দিকে দিকে তাণ্ডব শুরু হবে। তারপর আবার ট্রেন অবরোধ। লোকাল ট্রেনের একটা জেন্টস্ বগি কেটে একটা লেডিস বগি বাড়ায় রেল কর্তৃপক্ষ। তাতেই আগুনে ঘৃতাহতি। রেলে পুরুষ যাত্রী বাড়ছে না মহিলা যাত্রী বাড়ছে? রেল কর্তৃপক্ষ কিছুই বোঝে না। ওই তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রেল অবরোধ। অবশেষে যা ছিল তাই থাকবে বলে রেল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে। খামোখা আমরা হয়রানির শিকার হলাম। চোখ বাঁধা অন্ধ বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রীতার সঙ্গে এখন রাজনীতিকরণ হচ্ছে যা দিনে দিনে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে পৃথিবীটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে। রুদ্র, রুক্ষ্ম-সূক্ষ্ম আরও বেশি রাফ অ্যান্ড টাফ হয়ে যাচ্ছে।

খাদ্যের সংকট, মনুষ্যত্বের সংকট, ভালোবাসার সংকট-সংকটে ভরা পৃথিবী। স্পেস কমে যাচ্ছে, আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গরম হয়ে যাচ্ছে। আমার একলা আকাশ আর নেই, একলা পৃথিবী। সকলের ভিড়ে হারিয়ে গেছে আমার সেই পৃথিবী, আকাশ-নদী। চারদিকে শুধু ক্লান্ত প্রাণ। এই ঘোর সংকটময় পৃথিবীর অনৈতিক, দুর্নীতি, বর্বরতা, অরাজকতা, হানাহানির এপিসেন্টার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ— ভুল হলো কী? কী হবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ?

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

# নারী স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়

মৌ চৌধুরী

প্রথমেই বলতে হয় স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়, বিশেষ করে নারী স্বাধীনতা? একজন নারী কখন এবং কোন মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে পূর্ণ স্বাধীন বলে চিহ্নিত হবেন। বলা হয়, নারীর এখন সর্বত্র সমান অধিকার। এখন কোনো নারীই তথাকথিত অবলা নন। প্রায় সব নারীই নিজের জায়গায় পায়ের নীচে মাটি শক্ত করেছেন। নিজেদের দাবি ও অধিকার সম্পর্কে তাঁরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই কথন কী সর্বস্তরে সত্য? বাইরের দিকে চোখ মেললেই নারীদের নিয়ে দুই ধরনের ছবি ভেসে ওঠে। একদিকে নারীদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই বঞ্চনা, অবহেলা, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে নিপীড়ন, যৌন হেনস্থা, বাইরে বের হলেই নিরাপত্তাহীনতার ভয়।

অন্যদিকে দেখা যায়, আধুনিকতার নামে একদল স্বেচ্ছাচারী নারী। জীবন সংগ্রাম সম্পর্কিত কোনো ধারণাই নেই তাদের। যাদের কাছে সংসার মানেই বন্ধন। স্বামী ও সন্তানের বাইরে পারিবারিক সম্পর্কগুলো তাদের কাছে মূল্যহীন। বিয়ের পর এই নারীদের কাছে শাশুড়ি হয়ে ওঠে টার্গেট। শ্বশুরবাড়ির সকলেই হয়ে দাঁড়ায় শত্রু। দেখা গিয়েছে এই সব বিষয়ে ট্রেনিংদাতা হলেন মেয়ের মা। এর উপর নারী চাকুরিরতা বা উপার্জনশীলা হলে তো কথাই নেই। এই 'বাহির মুখী' মনোভাবের জন্য তাদের ধৈর্য নেই, কেবল আছে মানসিক অস্থিরতা। আরও একটি বিষয় প্রবল ভাবে দেখা যাচ্ছে, স্বামীদের উপর প্রভুত্ব ফলানোর অকারণ প্রচেষ্টা। পাশাপাশি সন্দেহ প্রবণতা। এই আবর্তে পড়ে অনেক স্বামীও চান সংসার থেকে অথবা জীবন থেকে মুক্তি। প্রতিনিয়ত 'আমি কি পেলাম' নারীদের এই ইচ্ছাকৃত ভাবনা গ্রাস করে চলেছে। ফলে হতাশা নিত্যসঙ্গী তাদের। এর জন্যই প্রতি নিয়ত ভাঙছে সংসার। আদালতে জমছে ডিভোর্সের ফাইল। ত্রিশের আগেই অনেক নারীর দু'তিনবার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় মনে করেন দেশের বিভিন্ন জায়গায় নারীদের ভেতর এই মানসিক অস্থিরতা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধির পেছনে আছে ভোগ বিলাসিতা, সীমাহীন চাহিদা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও প্রকৃত শিক্ষার অভাব। এই নারীরা বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত সংসারের। তাদের কলেজের ডিগ্রি আছে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সহ বিভিন্ন কারণে পরিবার ছোটো হয়ে এসেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ছোটো পরিবারে কখনো কুশিক্ষা, সামাজিক পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করে উগ্র আধুনিকতা শেখায় না। ভারতীয় রীতি ও শিক্ষায় সুখ-শান্তির জন্য সংসার গড়ে তোলা শেখায়। কিন্তু এই অতি আধুনিক নারীরা সমস্ত শিক্ষা উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের জন্য সংসার গড়ার চাইতে ভাঙতে বেশি পছন্দ করে। পারিবারিক বন্ধন না থাকার কারণে সন্তানদের ভেতর এর প্রভাব পড়ে। পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছে এই নারীরাই বয়স বেড়ে গেলে অসহায়তা ও একাকিত্বের মাঝে দিন কাটান।

এখন সমাজ শিক্ষিত ও সচেতন হয়েছে। নারীরা এগিয়ে গিয়েছেন বহুদূর। নারী-পুরুষে বিভেদ নেই। কিন্তু তবুও প্রশ্ন ওঠে, এই শিক্ষা লাভ করে নারীদের একটা অংশ ভারতীয় সংস্কার রীতির উলটো পথে হাঁটছেন কেন? পশ্চিমি ধ্যানধারণায় আকৃষ্ট হওয়া, নারীর পবিত্রতা বিসর্জন দেওয়াই অনেক নারীর কাছে আধুনিকতার চরম নিদর্শন। তাৎক্ষণিক আনন্দ তাদের কাছে জীবনের পরম প্রাপ্তি। এই আনন্দ তাদের জীবন ও সমাজকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা ভেবেও দেখে না।

ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকার বা নারী স্বাধীনতার বিষয়টি জটিল ও বিতর্কের জায়গায় চলে গিয়েছে। নারী স্বাধীনতা কখনোই আধুনিকমনস্ক হওয়া, শিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কুপথে এগিয়ে যাওয়ার অধিকারও দেয়নি। এই স্বাধীনতা বিভিন্ন রীতিনীতি, ঐতিহ্য বা পারিবারিক মাপকাঠির উপর সবটা নির্ভর করে না। কোনো নারী মনে করলেই রুচিশীল আচরণ, ধৈর্যশীল বা সহিষ্ণু হয়ে জীবন সুন্দর গড়ে তুলতে পারেন। বাইরের কর্মজীবন ও সংসার জীবন পাশাপাশি চলতেই পারে। এর জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানী, কর্পোরেট প্রধান, চাকুরিজীবী, ব্যক্তিগত উপার্জনশীল, অধ্যাপিকা হতেই হবে এমন কথা কে বলেছে? একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ, পরিপূর্ণ, রুচিপূর্ণ, অন্তরের আলোর শিক্ষায় বেড়ে ওঠা, সুস্থ মনের পরিচয় বাহক একজন আধুনিক নারীকে সকলেই শ্রদ্ধা করবেন, আর এমনটাই স্বাভাবিক। □

# ডায়াবেটিস রোগে হৃদযন্ত্র ও চক্ষু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে

**ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক**

ডায়াবেটিক রোগীদের হৃদযন্ত্র ও চক্ষু সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা জেনে রাখা ভালো। কারণ হৃদযন্ত্র বা চক্ষুর মধ্যে যে কোনো যন্ত্র বিকল হলেই বিপদ। চোখ দুটি গেলে তো দুর্দশার চরম অবস্থা।

**হৃদযন্ত্রের অসুখগুলির মধ্যে প্রধান হলো :**

১. হৃদযন্ত্রের বিঘ্নিত রক্তসরবরাহজনিত অসুখ।

২. উচ্চ রক্তচাপজনিত অসুখ।

এছাড়া ডায়াবেটিকদের— ৩. Peripheral vascular disease হতে পারে। এই রোগে বারবার পায়ে যন্ত্রণা এবং পায়ের আঙুল থেকে পচন শুরু হয়।

কীভাবে ডায়াবেটিস রোগ হৃদযন্ত্রের অসুখ সৃষ্টি করে তা সঠিক ভাবে বলা শক্ত। তবে দেখা যায় যে, ডায়াবিটিস রোগীদেরই Coronary heart disease এবং High blood pressure বেশি হয়। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাধিক্য কীভাবে হৃদযন্ত্রের রক্তসরবরাহকারী শিরাকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। ডায়াবিটিকদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ও প্লাজমা লিপিডের মাত্রা বেশি হয়, Coronary Disease-এও তাই। বহু রোগীর ইসিজি নিয়ে লক্ষ্য করা গেছে, শতকরা ২০ জন ডায়াবিটিক রোগীর ইসিজি-তে কিছু কিছু অস্বাভাবিক লিখন দেখা যায়। T-wave-ই প্রথমে ছোটো হতে থাকে বা বড়ো হয়। এমনকী উলটে যেতে পারে। এসটিটি-এর পরিবর্তনও লক্ষ্য করা গেছে ওইসব ক্ষেত্রে। এদের সকলের অবশ্য বুকে ব্যথা বা Coronoary disease-এর উপসর্গ থাকে না, শতকরা ২০ জনের হয়তো উপসর্গ থাকে। কাজেই ডায়াবিটিক রোগীদের বিশেষভাবে রক্তচাপ পরীক্ষা ও ইসিজি পরীক্ষা করা দরকার। সামরিক বিভাগে চাকরির ক্ষেত্রে একবার ডায়াবিটিক ধরা পড়লে বছরে অন্তত দুবার ইসিজি ও বুকের এক্সরে করা দরকার। সাপ্তাহিক বা দৈনিক প্রস্রাব পরীক্ষা করতে হবে। সেগুলি মাসে মাসে ডাক্তারকে দেখাতে হবে। তিন মাস ছ'মাস অন্তর মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞ ও চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে।

**ডায়াবিটিস রোগ ও চক্ষু :**

ডায়াবিটিসে চোখের বহু প্রকার জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন চোখের জীবাণু সংক্রামণাবস্থা, চোখের ট্যারা অবস্থা, চক্ষুগোলকের বহিঃস্থিত মাংসপেশীর অক্ষমতাবস্থার ফলে চোখের পাতার বাহির ভাগে হলদে দাগ, ডায়াবেটিস জনিত ছানি, ভিট্রিয়সের অস্বচ্ছতা ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই সব জটিলতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদি ভালোভাবে ডায়াবিটিস রোগীর চিকিৎসা হয়, যদি তাঁরা নিয়মিত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, নিয়মিত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করে, নিয়মিত ডাক্তার ও প্রয়োজন মতো বিশেষজ্ঞদের কাছে যান, তাহলে তাঁরা বহুদিন ভালো থাকবেন। তাতে সবরকম জটিলতার আবির্ভাবই বিলম্বিত হবে এবং বেশিরভাগ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবেই না।

উচ্চরক্তচাপের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে বা হৃদযন্ত্রের রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হওয়ার থাকলে আরও সাবধান থাকা উচিত। আসলে অসুবিধা হলো যে এদেশের হারপাতালগুলিতে এত ভিড় যে সেখানে বহির্বিভাগে ঠিকমত চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায় না। নিয়মিত বিনামূল্যে প্রস্রাব ও রক্তে চিনির পরিমাপের পরীক্ষার বন্দোবস্ত নিতান্ত প্রয়োজন গরিব রোগীদের জন্য। তা না হলে ডায়াবিটিকরোগীদের জীবন দুর্বিসহ হতে থাকবে।

ডায়াবিটিসের ওষুধ সরবরাহেরও অনেক অসুবিধা রয়েছে। অনেক সময় ইনসুলিন পাওয়া যায় না। দামও যথেষ্ট। সারাজীবন যে ওষুধ খেতে হবে গরিব রোগীর জন্য সেগুলি সুলভে বা বিনামূল্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা দরকার।

গরম আবহাওয়ায় ইনসুলিন বেশিদিন Refrigeratior-এর বাইরে রাখলে তার শক্তি ক্ষয় হয়। সেজন্য বাড়িতে বেশিদিন রেখে দিলে তা খারাপ হয়ে যেতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ডায়াবেটিক ক্লিনিকের একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে কিছু কিছু পে ক্লিনিক করলেও মন্দ হবে না। তাতে রোগী ভাগ হয়ে যাবেন— যাঁদের কিছু সামর্থ্য আছে, তাঁরা পে ক্লিনিকে যাবেন; যাঁরা গরিব তাঁরা ফ্রি ক্লিনিকে যাবেন। যাঁরা বিত্তবান, তাঁদের জন্য নিজ নিজ চিকিৎসক থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা গরিব তাঁদের কথাই বেশি ভাবা প্রয়োজন। □

# ওয়াকফ তো বাহানা, আসল উদ্দেশ্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ

**মন্দার গোস্বামী**

চারদিকে জান্তব উল্লাসে মত্ত একদল জেহাদি। গাড়ি থেকে গৈরিক পতাকা খুলে ফেলতে বাধ্য করা হচ্ছে, তাই উল্লাসের বহরটা একটু বেশি। একপাশে উর্দিধারী পুলিশ মোবাইল ফোনে ব্যস্ত। অন্যদিকে হিন্দুধর্মের চিহ্নযুক্ত গাড়ির কাচ লাথি মেরে চূর্ণ করে ফেলছে কোনো জেহাদি, মামুদ-ঘোরির যোগ্য বংশধর। মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান, সুতি, সামসেরগঞ্জ, জলঙ্গি থেকে হাওড়া, সাঁতরাগাছি, কলকাতার পার্ক সার্কাস— সর্বত্র একই চিত্রনাট্য। গরিব মুসলমানদের তো বটেই, অনেকক্ষেত্রে হিন্দুদেরও জমি দখলকারী ছিল ওয়াকফ বোর্ড। সেই ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদের নামে জেহাদিদের দ্বারা দিকে দিকে আক্রান্ত হিন্দুরা। পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়িঘর, লুঠ করা সম্পত্তি। প্রাণে মেরে দেওয়াও হচ্ছে। স্বাধীন ভারতে হিন্দুদের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছে অন্য জেলায়। বহু মা-বোন ধর্ষিতা। সম্পন্ন হিন্দু রাতারাতি কপর্দকশূন্য। হুবহু দেশভাগের সময়কার দৃশ্য।

কদিন আগেই মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে পাথর ছুড়ে ভেঙে দেওয়া হলো হিন্দু বাড়ির জানালার কাচ। হেনস্থা করা হলো বাড়ির বাসিন্দাদের। মহিলা, শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। জমায়েতের নামে হিন্দুদের ভীতি প্রদর্শন ও মারোকাটো বক্তব্য। তারপরই আক্রমণ, বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, হত্যা, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস। অ্যাম্বুলেন্স ও শ্মশানযাত্রীদের ও রেহাই নেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষক পুলিশই যেখানে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত , সেখানে সাধারণ হিন্দুদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বুকে এটাই হলো ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদের নামে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের সামগ্রিক দৃশ্য। কোনো একটি আইনের প্রতিবাদ তো করাই যায় গণতান্ত্রিক পথে, শান্তিপূর্ণভাবে। আইন প্রণয়ন হলো একটি সরকারি প্রক্রিয়া। এর সঙ্গে সাধারণ হিন্দুর কোনো সম্পর্ক নেই। এই আইন সংশোধনের ফলে গরিব মুসলমানরাই উপকৃত হয়েছে। আগে এটি এমন এক আইন ছিল, যার বলে যেকোনো জমি যখন-তখন দখল করে নেওয়া যেত। সভ্য সমাজে এই নিয়ম চলতে পারে না। সারা বিশ্বে কোথাও নেই। এই আইনের সংশোধনের দাবি মুসলমানদের পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল। ভারতের বহু স্থানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই সংশোধনী আইনকে স্বাগত জানানো হয়েছে। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া কোথাও নেই। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রতিবাদের মাত্রা হিংস্র থেকে হিংস্রতর। আর এটা পরিষ্কার যে রাজ্য সরকারের উসকানিতেই হিন্দুদের ওপর এই আক্রমণ সংঘটিত হয়ে চলছে। প্রতিবাদের আড়ালে জেহাদি উদ্দেশ্য ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

জেহাদের মূল কথা এটাই যে, বিধর্মী হিন্দুদের এই পৃথিবীতে বাঁচার কোনো অধিকার নেই। গোটা বিশ্ব হবে দার-উল-ইসলাম। এই উদ্দেশ্যেই আফগানিস্তান হিন্দুশূন্য হয়েছে। পাকিস্তান প্রায় হিন্দুশূন্য আর বাংলাদেশে জোর কদমে এই প্রক্রিয়া চলছে। একই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায়। জেহাদি আক্রমণের কারণে সেই এলাকায় হিন্দুদের জীবন জীবিকা, নারীর মানসম্ভ্রম ভীষণভাবে বিঘ্নিত। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি নাবালকরাও হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানি ও ধ্বংসাত্মক কাজে মত্ত। আসলে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ তো বাহানা মাত্র, এদের মূল উদ্দেশ্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ।

মুসলমান ভোটব্যাংকের লোভে, রাজনৈতিক উসকানিতে, প্রশাসনিক প্রশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে জেহাদের উর্বর মাটিতে পরিণত হয়েছে। বিষাক্ত জেহাদিরা লতায়-পাতায়, ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে হিন্দু জনজীবনকে করে তুলেছে বিপর্যস্ত। ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠীর স্লিপার সেল এরাজ্যে সর্বত্র ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ এখনো কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তারা 'ভাতা' পেয়েই খুশি। এই জেহাদিদের আক্রমণ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। এ বিপদ সারা ভারতের। কাশ্মীরের পহেলগাঁও আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্যানিং, নলিয়াখালি, ধুলাগড়, কালিয়াচক, মোথাবাড়ি, বেলডাঙ্গা এবং সম্প্রতি ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জে তার ট্রেলার আমরা দেখলাম। পশ্চিমবঙ্গের জেহাদিদের মদতদাতা এই রাজ্য সরকারকে উৎখাত করেত না পারলে, বাঙ্গালি হিন্দুদের কিন্তু নিজভূমেই পরবাসী হতে হবে, একথা মনে রাখতে হবে।

# ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলনের নামে পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি শক্তির উত্থান

**ড. তরুণ মজুমদার**

ওয়াকফ সম্পত্তির রাজ্যওয়াড়ি তালিকায় চোখ রাখলে দেখা যায় প্রথম স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। সেখানে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের কাছে রয়েছে ২.১৭ লক্ষ সম্পত্তি এবং শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের হাতে রয়েছে ১৫ হাজার ৩৮৬টি সম্পত্তি। অদ্ভুত হলো সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি উত্তরপ্রদেশে, অথচ সেখানে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই, আর আমার আপনার এই পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী থেকে গ্রামগঞ্জ ক্রমাগত উগ্র জেহাদি আন্দোলনের শিকার হয়ে চলেছে। সত্যিই কি ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা চলছে এই রাজ্যে? তাই যদি হয়, তবে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের মা শীতলার মন্দির ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হলো কেন? কেন হিন্দু পিতা-পুত্র হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে গলা কেটে হত্যা করা হলো? কেন বেছে বেছে হিন্দুদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুঠ করা হচ্ছে? কেনই-বা দলে দলে হিন্দু মুর্শিদাবাদের ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদে পার্শ্ববর্তী মালদা জেলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে?

এ কোনো বৃহত্তর ষড়যন্ত্র নয় তো? উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গের একেবারে উপরের জেলাগুলি ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে ১২'র মাধ্যমে। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার নামে এই ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে পণ্যবাহী ট্রাকে অগ্নি সংযোগ ও যথেচ্ছ লুঠতরাজ চলছে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। ২০২০ সালে জেএনইউ'র ছাত্র সার্জিল ইমাম আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ি করিডোরকে অবরুদ্ধ করার মাধ্যমে অসম-সহ উত্তরপূর্ব ভারতকে বাকি ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলেছিল। বর্তমানে তৃণমূলের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ক্রমাগত উসকানিমূলক মন্তব্য করেই চলেছেন। তিনি বলছেন 'আগে জেলায় জেলায় টাইট দিই, তারপর কলকাতাকে দেবো।' রাজ্য সরকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার সড়ক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বছরের পর বছর সময় নষ্ট করে গেছে। উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাকি ভারতের যোগাযোগের মাধ্যমগুলির উন্নতি প্রকল্পে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের এই অনীহা সংশয় উদ্রেককারী। কেননা এর সঙ্গে দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন জড়িত।

শেষে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের কাজ যখন অনেকাংশে সম্পন্ন হলো, তখন সেই রাস্তাকে অকার্যকরী করে রাখতে শুরু হলো আমডাঙা থেকে মুর্শিদাবাদ-মালদা পর্যন্ত রাস্তা বরাবর জেহাদি তাণ্ডব। বড়ো কোনো জঙ্গি নাশকতার আগে দুষ্কৃতকারীরা যেমন রেইকি করে, মুর্শিদাবাদের এই তাণ্ডব বড়ো কোনো ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করার আগের রেইকি হলে, তা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া এখনো অনেক জায়গায় বাকি। পোরাস বর্ডার এবং এ রাজ্যের জেহাদি গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সুদখোর ইউনুস এবং পাকিস্তানের আইএসআই এজেন্টরা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর এই তাণ্ডবলীলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে এবং বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর হিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু, সেখানে হিন্দুদের প্রাণ ও সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখতে ভারত সরকারের অবিলম্বে কঠোরতম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যে কায়দায় বাংলাদেশে ২০২৪-এর জুলাই মাস থেকে মোল্লাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেই একই কায়দায় মালদা, মুর্শিদাবাদে জেহাদি তাণ্ডব চলছে। বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা থেকে মালদা- মুর্শিদাবাদে অনুপ্রবেশকারী মোল্লাবাদী স্লিপার সেলগুলি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র দেশের জন্যই বিপজ্জনক। অনতিবিলম্বে বর্ডার সংলগ্ন জেলাগুলিতে সামরিক বাহিনী নামিয়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে দেশ বিরোধী এই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করা প্রয়োজন। ■

# পুণ্যশ্লোক দেবী অহল্যাবাঈ হোলকরের ত্রিশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির আলোচনা সভা

গত ২০ এপ্রিল উত্তর কলকাতায় বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গের সহযোগিতায় এবং লক্ষ্মীবাঈ কেলকর সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ইন্দোরের মহারানি পুণ্যশ্লোক দেবী অহল্যাবাঈ হোলকরের ত্রিশতবর্ষ জন্মজন্তী উপলক্ষ্যে একটি আলোচনাসভা। সভায় অংশগ্রহণ করেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষজন।

দেবী অহল্যাবাঈয়ের কর্মময় জীবন এবং সামাজিক উন্নয়নযজ্ঞে তাঁর বিশিষ্ট অবদান সম্পর্কে এই আলোচনাসভায় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেন আইনজীবী সুস্মিতা সেন, সুতপা বসাক ভড়, ডঃ অলি ব্যানার্জি। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ডঃ শরদ রেণু শর্মা। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মহামায়া চ্যাটার্জি। সভার অধ্যক্ষার আসন অলংকৃত করেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠের সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা মাতাজী। এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সহকার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকর, প্রান্ত সঞ্চালিকা মহুয়া ধর, সেবিকা সমিতির অন্যান্য কার্যকর্ত্রী ও সেবিকা বোনেরা।

বক্তব্য, আলোচনা ও সংগীত-সহ ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের একজন অসামান্যা নারী হিসেবে দেবী অহল্যাবাঈয়ের প্রেরণাদায়ী জীবন-আধারিত সুন্দর একটি দেওয়াল পত্রিকার উন্মোচন ইত্যাদির মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন প্রান্ত কার্যবাহিকা মৌসুমী কর্মকার।

# কাশ্মীরে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিটে এবিভিপি-র বিক্ষোভ

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের কাছে বৈসরান উপত্যকায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা হিন্দু পর্যটকদের চিহ্নিত করে গুলিবর্ষণ করে হত্যা করে। এই হামলায় ২৮ জন নিহত হন এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে গত ২৩ এপ্রিল কলকাতা কলেজ স্ট্রিটে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে এর বিরাট পথসভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এবিভিপি-র কলকাতা মহানগর সম্পাদক দেবাঞ্জন পাল-সহ ৩৫ জন কার্যকর্তা এই কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন।

# বহরমপুরে মহারাজা শশাঙ্ক স্মৃতি মঞ্চের নববর্ষ উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও মহারাজা শশাঙ্ক স্মৃতি মঞ্চের উদ্যোগে নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে বিগত বছরগুলির মতো এবার শুধু ঘরোয়া অনুষ্ঠানের নধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে খাগড়া শৈদাবাদের কপিল মাঠের প্রাচীন শিবমন্দির থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বর্ষবরণ উৎসব পালন করা হয়। প্রথমে কপিল মাঠে জমায়েত এবং সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে মাতৃমণ্ডলী দ্বারা গঙ্গার গোপালঘাটে জল ভরে কলসযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শিবমন্দিরে ফিরে এসে গঙ্গাজলে রুদ্রাভিষেক ও পূজার্চা করা হয়।

পরে বঙ্গাধিপতি মহারাজা শশাঙ্ক এবং তাঁর প্রবর্তিত বঙ্গাব্দের সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মহারাজা শশাঙ্ক স্মৃতি মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দত্ত। উপস্থিত ছিলেন বহরমপুরের বিধায়ক সুব্রত মৈত্র, বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম রায় এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা কাযঅবাহ সঞ্জয় হালদার- সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

# মালদা জেলা সংস্কৃতভারতীর বার্ষিক জনপদ- সমীক্ষা-যোজনাগোষ্ঠী বৈঠক

আগামী বছরের নতুন পরিকল্পনা এবং সংস্কৃতভাষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আলোচনা ও প্রচার মাধ্যমগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য গত ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হলো মালদা জেলা সংস্কৃতভারতীর বার্ষিক জনপদ-সমীক্ষা-যোজনাগোষ্ঠী বৈঠক। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বৈঠকের উদ্বোধন করেন গাজোল মশালদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা সংস্কৃতভারতীর গাজোল খণ্ডের উপাধ্যক্ষ শ্রীভাগবৎ রায়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ কার্যাকারিণীর সদস্য প্রবীর কুমার মিত্র, সংস্কৃতভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক জয় সাহা এবং উত্তরবঙ্গ বালকেন্দ্র প্রমুখা শ্রীমতী তাপসী মণ্ডল। মালদা জেলার ইংলিশবাজার, পুরাতন মালদা, গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা ও চাঁচল খণ্ড থেকে পরিকল্পনা গোষ্ঠীর ২৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে মালদা জেলায় সংস্কৃতভাষা প্রচারের কাজকে আরও গতিশীল করার পরিকল্পনা করা হয়।

# শিলিগুড়িতে স্বস্তিকা পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ২০ এপ্রিল শিলিগুড়ির মাধব ভবনে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং স্বস্তিকা পত্রিকা প্রকাশনার যৌথ উদ্যোগে স্বস্তিকা পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ গোষ্ঠাবিহারী দাস। মুখ্য বক্তা রূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দুজন সন্ন্যাসী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ সুনীল কুলকর্ণী, ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী, সহ কার্যবাহ বিশ্বরূপ কুণ্ডু, প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ। সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত অতিথিবর্গ ভারতমাতা ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ তিলকরঞ্জন বেরার স্বাগত ভাষণের পর মঞ্চাসীন অতিথিগণ স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন করেন। স্বস্তিকার প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল স্বস্তিকার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। মুখ্য বক্তার ভাষণে শ্রীদত্ত বর্তমান সময়ে স্বস্তিকা পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভাপতির ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঙ্ঘের

শিলিগুড়ি বিভাগ কার্যবাহ ডাঃ বিশ্বপ্রতীম রুদ্র। বন্দেমাতরম্ গানের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, শিলিগুড়িতেও সকালে প্রচার প্রতিনিধিদের বৈঠক সম্পন্ন হয়।

# রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্ত বৌদ্ধিক অভ্যাস বর্গ

গত ১৭ থেকে ২০ এপ্রিল কলকাতা সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট স্থিত রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কার্যালয়ে সমিতির প্রান্ত বৌদ্ধিক অভ্যাস বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশের ১০টি বিভাগ থেকে ৫০ জন সেবিকা ও কার্যকর্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সহ সরকার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকর, অখিল ভারতীয় বৌদ্ধির প্রমুখ ডঃ শরদ রেণু এবং লতিকা পডহি।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

# বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে শ্রীহনুমান জয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তর কলকাতা জেলার দমদম প্রখণ্ডের উদ্যোগে গত ১২ এপ্রিল দমদম রোডে সেন্ট মেরিজ স্কুলের সামনে শ্রীরামমহোৎসব ও শ্রীহনুমান জয়ন্তীর কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ধর্ম প্রসার প্রমুখ শম্ভু কুণ্ডু, বিশ্ব হিন্দু বার্তার প্রচার প্রসারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তা জয়ন্ত ভৌমিক, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার-প্রসার প্রমুখ অরিন্দম কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী সায়ন্তন বসু, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, মৌমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর কলকাতা জেলার সভাপতি তীর্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ চৌধুরী, জেলা সহ-সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ, জেলা সহ-সম্পাদক কার্তিক শাসমল, জেলা কোষাধ্যক্ষ অশোক দাস, জেলা ধর্ম প্রসার প্রমুখ শঙ্কর দে-সহ পরিষদের অন্যান্য কার্যকর্তারা ও অসংখ্য মানুষ। শ্রীরামনবমী ও শ্রীহনুমান জয়ন্তীর মাহাত্ম্যের বিষয়টি বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে। মহাসমারোহে এদিন দমদমে উদ্‌যাপিত হয় শ্রীরামমহোৎসব ও শ্রীহনুমান জয়ন্তী।

# মুর্শিদাবাদে জেহাদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের পদযাত্রা

সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী আইন পাশের পর মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ও জাফরাবাদে হিন্দুদের উপর জেহাদিরা চালায় ভয়াবহ সন্ত্রাস। জেহাদিদের হাতে সংঘটিত হয় হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর পুত্র চন্দন দাসের নারকীয় হত্যাকাণ্ড। হিন্দু নারীরা জেহাদিদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। হিন্দুদের বাড়ি-ঘর-দোকানপাটে চলতে থাকে অবাধ লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ। পুলিশ- প্রশাসন থাকে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। প্রাণ বাঁচাতে হিন্দুরা ঘরছাড়া হয়ে দলে দলে আশ্রয় নিতে থাকে মালদহ জেলায়। সন্ত্রাসের জেরে অনেকে পালিয়ে গিয়েছেন পাশের রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ডে। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের উপর চলতে থাকা সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এবার পথে নামলো হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ। হিন্দুদের সুরক্ষার দাবিতে গত ২২ এপ্রিল হাওড়া-শিয়ালদহ থেকে মধ্য কলকাতার ধর্মতলার দিকে পদযাত্রা করে আসেন হাজার হাজার মানুষ। হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের আহ্বানে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মানুষ এদিন জমায়েত করেন হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে। এই পদযাত্রায় শামিল হয়ে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দুর্নীতির ফলে শিক্ষকদের প্যানেল বাতিল এবং অযোগ্যদের বাঁচাতে গিয়ে যোগ্য শিক্ষকদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদেও তাঁরা মুখর হন। মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর জেহাদি আক্রমণের ঘটনার বিরুদ্ধে এদিন সংগঠিত প্রতিবাদের সাক্ষী রইলো কলকাতা মহানগর।

# মহাজাতি সদনে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

১৮৮৮ সালে নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে মাধবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। গত ১৪ এপ্রিল মধ্য কলকাতায় মহাজাতি সদনে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিপ্লবী, জননেতা যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ১৩৮তম জন্মদিবস পালিত হয়। এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্পাদক তথা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের নাতি তরুণ বিশ্বাস, সমিতির সহ-সভাপতি গোপাল চক্রবর্তী, স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন বিশ্বাস বাগচী, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নাতি পার্থসারথি বসু, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাতবৌ মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বোস রিসার্চ ব্যুরোর সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য্য, আন্দামান জেলে দীর্ঘ জীবন কাটানো বিপ্লবী কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর নাতনী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত অ্যাকাডেমির ম্যানেজিং ট্রাস্টি শুভ্রকান্ত দত্ত, বিপ্লবী যতীন দাশ স্মৃতি সমিতির সম্পাদক সুবীর কুণ্ডু, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের পরিবারের সদস্য ও সদস্যা সুদীপ বিশ্বাস, সুতপা বিশ্বাস, এমিলি বিশ্বাস, কল্পনা বিশ্বাস ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে মালা ও পুষ্পার্ঘ্য তাঁরা অর্পণ করেন। দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনান ধ্রুব হালদার, চন্দ্রাণী কর্মকার প্রমুখ সংগীতশিল্পী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ করেন। ব্রিটিশ শাসনে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন। বরেণ্য এই বিপ্লবী শেষ জীবনে নিদারুণ আর্থিক কষ্ট ভোগ করেছিলেন। ৯০ বছরের বেশি বয়সে তাঁর দেখাশোনা করার মতো কেউ ছিলেন না। অশেষ কষ্ট সত্ত্বেও এই তেজস্বী মানুষটি দৃঢ়তার সঙ্গে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন' প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'আমরা দেশকে যথাসাধ্য দিতে এসেছি, নিতে আসিনি।' শেষ বয়সে চোখে দেখতে পেতেন না, কিন্তু তাঁর স্মরণশক্তি ছিল প্রখর, কণ্ঠস্বর ছিল স্পষ্ট। ১৯৮৩ সালে ১৮ মার্চ কলকাতায় তাঁর বাসভবনে এই মহান বিপ্লবীর জীবনাবসান হয়। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তথা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের নাতি তরুণ বিশ্বাস। একই দিনে কলেজ স্কোয়ারে চাঁদপুর সম্মিলনী সভাঘরেও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের জন্মদিন পালিত হয়।

ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে মুর্শিদাবাদ জেলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণের প্রতিবাদ করতে কলকাতায় আসেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি অলোক কুমার। গত ২০ এপ্রিল বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে সকাল ১১টায় তিনি বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় মিলিত হন। উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ, মহানাম অঙ্গনের জাতীয় সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সহ সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায়, বিশ্ব হিন্দু বার্তার মুখ্য উপদেষ্টা তথা দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি দিলীপ কুমার ঝাঁওয়ার, বিশ্ব হিন্দু বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত বিশ্বাস, প্রান্ত সম্পর্ক বিভাগের প্রমুখ সৌগত বসু, সহ প্রমুখ দীপক চৌধুরী, বিশ্ব হিন্দু বার্তার প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়ন্ত ভৌমিক এবং দুর্গবাহিনীর প্রান্ত প্রমুখ পারমিতা পাল।

# বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্টের উদ্যোগে এবং বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বিপ্লবী যতীন দাশ স্মৃতি সমিতি ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সহযোগিতায় গত ১৬ এপ্রিল অগ্নিযুগের বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর ১৪০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার অন্যতম বিপ্লবতীর্থ মুরারীপুকুরের ঋষি অরবিন্দ ঘাটে একটি বিশেষ স্মরণসভা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতে ইউনেস্কোর অফিসিয়াল পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ আর্টের গুডউইল অ্যাম্বাসাডার বিপ্লব রায়। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উল্লাসকর দত্তর ভ্রাতুষ্পৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত, বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বক্সীর পৌত্র শোভনলাল বক্সী, বিপ্লবী হৃষিকেশ চক্রবর্তীর নাতনি মিঠু চক্রবর্তী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিবারের সদস্য তথা 'মিশন বিদ্যাসাগর'-এর কর্ণধার অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাতি শান্তনু মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তর ভাইপো পরিমল সেনগুপ্ত, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন বিশ্বাস বাগচী, ভারত ভাবনা দলের সভাপতি তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যজ্যোতির সম্পাদক প্রদীপ দত্ত-সহ বহু বিশিষ্টজন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম গবেষক পুষ্প চ্যাটার্জি দত্ত, অধ্যাপিকা প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়রা ভারতীয় ইতিহাসের সঠিক চর্চা ও গবেষণার গুরুত্বের বিষয়টি তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষজন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর চিন্তাধারার মাধ্যমে কীভাবে সমাজকে উৎকর্ষতার শিখরে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিপ্লবী দেবেশ কুণ্ডুর নাতি সুবীর কুমার কুণ্ডু। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর ভ্রাতুষ্পুত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত সংবাদমাধ্যমকে জানান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংগঠিতভাবে, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তদের মতো অখ্যাত বিপ্লবীদের বীরগাথা আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে। বীরাঙ্গনা রানি দুর্গাবতীর পরিবার-সহ হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী রাজগুরু ও বিপ্লবী সুখদেব থাপারের পরিবারের পক্ষ হতেও এদিন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় দূরভাষের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

## কেশব ভবনে আরোগ্য ভারতীর কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ

মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি আয়ুর্বেদ, যোগচর্চা এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করার উদ্দেশ্যে গত ১৮ এপ্রিল কলকাতা কেশব ভবনে আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ অনুষ্ঠিত হলো। সারাদিন ব্যাপী এই বর্গে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক ডঃ মুরলী কৃষ্ণ, পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক রাজেশ কর্মকার। বর্গে দক্ষিণবঙ্গের ১৫টি জেলা থেকে ৯২ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

**গত ২০ এপ্রিল শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় ব্রহ্মকুমারী কেন্দ্রে পরমপূজনীয়া রাজযোগিনী রতনমোহিনী দাদীজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ এবং শিলিগুড়ি মহানগর সহ সম্পর্ক প্রমুখ। শ্রদ্ধাঞ্জলিসভায় সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক এবং মাননীয় সরকার্যবাহ প্রেরিত শোকবার্তা পাঠ করা হয়।**

# রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশবোধ

## এক বহুমাত্রিক চেতনা সংকলন

**ড. রাজলক্ষ্মী বসু**

শব্দে, নিবন্ধে অনেক বিষয়কে পূর্ণ রূপ দেওয়া বেশ কঠিন হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্বদেশ চেতনা। এতটাই বহুমাত্রিক এই চেতনার প্রকাশ যে তাকে বোঝা, অনুভব করা, আত্মস্থ করা সহজ কথা নয়। কমপক্ষে এক যুগ প্রয়োজন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তার অতলে যেতে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রচিন্তা, স্বদেশ জাগরণী মন্ত্র। তিনি নিন্দা করছেন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ধনতান্ত্রিক আগ্রাসনের। সমন্বয়বাদী ধারণায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পশ্চিমের মিলন চেয়েছিলেন বটে, তাই ইসলামিক বর্বরতা তারপর ইংরেজ শাসনে ভারত যখন সামাজিক ভাবে জর্জরিত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তাস্তর অতিক্রম করে রবি ঠাকুর বলতে পেরেছেন ‘ইউরোপের প্রদীপের মুখে শিখা জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে।’

নৈবেদ্য কবিতার সঙ্গে যখন পরিচিত হয়েছি, তখনই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চেতনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। যেখানে ভক্তিতত্ত্ব ও তপোবন চেতনা এবং তারই পাশে শাসক বিরোধী অন্যায় বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট। স্বদেশী সমাজ (১৯০৪) প্রবন্ধে রবি ঠাকুরের স্বাদেশিকতার সুচিন্তিত রূপ প্রতীয়মান। ঠিক তার পরেই ‘অবস্থা ও ব্যবস্থা’ (১৯০৫) রচিত হলো। ১৯০৮ সালে পাবনা সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে যে রাজনৈতিক চিন্তা দর্শন রেখেছেন তা স্বদেশী সমাজ রাষ্ট্রবোধের নিখাদ দলিল। ‘গ্রাম পড়ে আছে মধ্যযুগে আর শহর আধুনিক যুগে... বলতে গিয়েই তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে সাবধান করে পল্লী সমাজের রূপ দেখান। জীবন জীবিকায় সমবায় নীতি, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা— তবেই তৈরি হবে আধুনিক পল্লীসমাজ। বঙ্গভঙ্গের সময় যখন রাজনৈতিক সুবিধাবাদ অনেকটাই শহরমুখী। তখন রবি ঠাকুর পথ দেখিয়েছেন কেমন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়া যায়।

তাঁর সেই ক্ষুদ্র ঋণ ও গ্রাম উন্নয়ন নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি এতটাই বিজ্ঞানসম্মত, বলিষ্ঠ, আধুনিক যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু অনুন্নত আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশ তা মডেল হিসেবে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের এটাই ম্যাজিক যা কেবলমাত্র আমাদের জন্য সত্য নয়, তা বিশ্ব মানবতার জন্য সত্য ও সুন্দর। কালক্ষণে ১৯৩০-৩১ ছিল স্বাধীনতার অবিস্মরণীয় সময়। বিপ্লবী সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবী বনাম ইংরেজের অসম লড়াই, প্রীতিলতার আত্মত্যাগ, লাহোরে বিপ্লবী ভগত সিংহ ও সহকর্মীদের ফাঁসি, ১৯২৯-এ যতীন দাসের টানা ৬৩ দিন অনশন— রবীন্দ্রনাথের কলমে আগুন তখন ‘সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ— হে ভৈরব শক্তি দাও...।’ তিনি আবারও লিখছেন, ‘মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।’ এর ঠিক পর ১৯৩২ সাল, হিজলি ও বক্সা কারাগৃহ থেকে বিপ্লবীরা ২৫শে বৈশাখ রবিঠাকুরকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানান, কবিও আপ্লুত। উত্তর দেন বীর বিপ্লবীদের। সেলুলার জেলে অনশনরত রাজবন্দিদের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী। তিনি সরকারের কাছে বন্দি ফেরাতে স্মারকলিপি দিলেন। ১৯৩৭ সালে বন্দি মুক্তির দাবিতে

অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের টাউন হলের প্রতিবাদী ভাষণ আজকেও স্মরণযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ যে কী প্রচণ্ড শাসকবিরোধী তা সেদিন বোঝা গেল তাঁর কিছু কথায়, 'ভারতের শাসন কর্তৃপক্ষ ফ্যাসিস্ট আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। আমার দেশের নামে এসবের প্রতিবাদ করিতেছি।' ওই সভায় আন্দামান রাজনৈতিক বন্দি সহায়ক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন রবিঠাকুর। উৎকণ্ঠায় তিনি বার্তা পাঠান আন্দামানে বন্দি বিপ্লবীদের উদ্দেশে। প্রসঙ্গত, এই সময়েই তিনি তাঁর রচিত 'প্রচলিত দণ্ডবিধি'-তে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'দণ্ড দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য ডাক পাঠানো' কিংবা ঘোষণার সুরে বলা 'দামামা ওই বাজে/ দিন বদলের পালা এল গোড়োযুগের মাঝে' —দেশকে, জাতিকে বাঁচার, আরও একবার ক্লান্ত না হয়ে ওঠার অনুঘটক প্রদান করেছে। কালান্তরের প্রবন্ধগুলি যেন হীরা মণি মাণিক্য। যেসব গদ্যে কোনো আপোশবাদিতা নেই।

স্বদেশ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সুভাষ প্রীতি চোখে পড়ার মতো। তাসের দেশ নাটকটি যখন উৎসর্গ করছেন সুভাষচন্দ্র বসুকে তখন লিখলেন, 'স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে।' শিলাইদহে পদ্মাতীরে বসে তিনি যখন লিখছেন, 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে/অস্ত গেল'— সে যে তীব্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। বক্সার যুদ্ধ কবির বিচারে ইংরেজ নিষ্ঠুরতা। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বুলেট-কলম তীব্র শ্লেষে লিখল, 'ক্ষুধিত ইম্পিরিয়ালিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, ইম্পিরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহাদের খরচ জোগানো, সোমালিল্যান্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া' (সফলতার সদুপায় ১৯০৪)। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধ শুধু বঙ্গ, বিহার বা সমগ্র ভারতের জন্য নয়। যে বোধে তিনি বিশ্ব মানবদরদি। ভারতীয় দর্শনের যা ভিত, ভিত্তি, শিকড়— কবি যেন তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন অকৃত্রিমভাবে। স্বাধীনতার অর্থ নতুন করে শেখালেন রবিঠাকুর। স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে নিজ সত্তার ধারণের মানসিকতা গঠন জরুরি। তাই শিক্ষা, সংস্কৃতি সবের মধ্য দিয়েই তিনি জাতিকে ঘুম থেকে তুলতে চেয়েছেন—

'চলো যাই, চলো, যাই চলো যাই—
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে—
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।'

স্বদেশী আন্দোলনের কাল। ১৯২০। গান্ধীদর্শন থেকে সরে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন দর্শন গঠন করলেন। তিনি আত্মশক্তি গঠনের দিকে জোর দিতে উৎসাহিত করছেন। রবীন্দ্র মনীষায় তাই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আদর্শ। শিবাজী জীবনদর্শন পাঠেই শোষণ মুক্তি সম্ভব। রাষ্ট্রবোধে ছত্রপতি শিবাজীই রোল মডেল। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে রবিঠাকুর বীরত্বের জয়গানে ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা মহীরুহ হিসেবে যখন শিবাজীর দর্শনে ভারতবোধকে জাগ্রত করেন তখন তাঁর স্বদেশপ্রেম ইতিহাসবোধে রাষ্ট্রচেতনার আদর্শ স্পষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধ মানে কেবলমাত্রই 'বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল' বা এমন গান, কবিতা রচনা নয়। তা তো সাহিত্যফল মাত্র। আমাদের দেখতে হবে তাঁর গভীর রাষ্ট্রবোধের চিন্তন কতদিকে চালিত হতো। দেশজ বৈশিষ্ট্যকে তিনি বারবার অনুভব করতে বলতেন। তাই তিনি বলেন, 'যে প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমস্ত দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থ ভাবে দেখে না।' স্বদেশ চিন্তার মানবিক দিকের পাশাপাশি কবি স্বরাজ চিন্তার রাজনৈতিক দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন। বলেছেন, 'বিদেশি রাজা চলিয়া গেলেই যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।'

এ এক অতি উচ্চ দর্শন যেখানে চিন্তার সূচনাবিন্দু দেশকে জানার ভিতর দিয়ে আত্মোপলব্ধি এবং সেই স্বদেশ স্বরাজ চিন্তার মূল উপাদান মনুষ্যত্বকে বন্ধনে আনা। তাই স্বদেশবোধে ভাববাদী ও বস্তুবাদী চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ। ত্যাগের দারিদ্র্য তিনি চেয়েছেন, অভাবের দারিদ্র্য নয়। জাতীয় সম্মানবোধ রবীন্দ্রনাথ নতুন স্বাদে শেখালেন— 'আমাদের দেশে সকলের চেয়ে বেশি দরকার হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া।' সোশ্যাল মবিলিটি বোধহয় স্বদেশীকালে রবিঠাকুরই সবচেয়ে গভীর ভাবে ভেবেছেন। জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের কথা সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তিনিই ভাবলেন— 'আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউ কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারও নেই।

...বিদেশকে যতক্ষণ আমরা কিছু দিতে পারি না, বিদেশ হইতে ততক্ষণ আমরা কিছু লইতেও পারি না; লইলেও তাহার সঙ্গে আত্মসম্মান থাকে না বলিয়াই তাহা তেমন করিয়া আপনার হয় না, সংকোচে সে অধিকার চিরদিন অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গত হইয়া থাকে।' বিকাশ কী? ঐক্যবোধ। তাইতো তাঁকে বলতে শুনি, 'আমার দুর্ভাগা দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন গড়িয়া তোলাই কঠিন', বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ।' এই মৌল আবেদনকে আজকেও, এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও সমগ্র বিশ্ব প্রণতি জানাবে। ভারতকে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজদ্বার পর্যন্ত যদি পরতে পরতে প্রতি আণুবীক্ষণিক স্তরে কেউ পর্যবেক্ষণ করেন, সবচেয়ে আধুনিক দৃষ্টিতে যদি কেউ ভাবেন, তবে তা নিশ্চিত রবীন্দ্রনাথ। তিনি নিজেই এক আস্ত, স্বতন্ত্র, স্বতঃস্ফূর্ত স্বদেশবোধ যা ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্টি হলেও তার মূল্যায়ন সম্পূর্ণ রূপে আজকেও আমরা করতে পারিনি। □

# হিন্দু সঙ্ঘশক্তির এক আশ্চর্য রূপকার
# আদি শঙ্করাচার্য

**ড. সর্বাণী চক্রবর্তী**

সংস্কৃত লোকোক্তিতে বলা হয়েছে— 'সঙ্ঘেশক্তিঃ কলৌ যুগে' অর্থাৎ কলিতে সঙ্ঘশক্তিই উত্তরণের উপায়। এই আপ্তবাক্যটির যথার্থতা ও গভীরতা আদি শঙ্করাচার্য হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন।

জৈনমতের ইতিহাসে আছে যে— প্রাচীন সনাতন ধর্মের বহু আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বেদমার্গ বহির্ভূত মতের আবির্ভাব হয়েছিল। জৈনরা সে যুগে নির্গ্রন্থ অর্থাৎ গ্রন্থি বা বন্ধনহীন শ্রমণ নামে পরিচিত ছিলেন। ৫৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাবীর আবির্ভূত হন। ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আবির্ভূত হন তথাগত। বুদ্ধদেব প্রচারিত মত উপনিষদের সারতত্ত্ব অবলম্বনে গ্রন্থিত হয়। ঠিক সেরূপ জৈনমতও বেদান্ত হতে সৃষ্ট। সেই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনমত ছাড়াও ভারতে আরও একটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল যার নাম 'আজীবিক মত।' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোশাল। বৌদ্ধ ও জৈনমতের মধ্যে একটাই পার্থক্য যা হলো জৈনরা শেষ পর্যন্ত আদি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের কাছাকাছি পৌঁছেছেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সময়ে তান্ত্রিকতার প্রভাবে দেখা দিয়েছিল নানা বিশৃঙ্খলা। এর ফল যে ভালো হয়নি তা ইতিহাসই বলে। তাই দেখা যায় আদি শঙ্করাচার্য বৌদ্ধদের সঙ্ঘারামগুলির অবনমনের কথা জেনে তিনি দৃঢ়হস্তে সঙ্ঘশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বেচ্ছায় স্বমহিমায় নিজ জীবনীশক্তিতে যা হবে ভরপুর।

তাঁরই সৃষ্ট দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ধর্মের পুণ্যসলিলে সমাজ ও রাষ্ট্রকে অক্ষুণ্ণ রাখার বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে এই দশনামী সম্প্রদায় সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যগাঙে বান আনে। তিনি ভারত ভ্রমণ করেছেন ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা যে বেদরূপ মহীরুহেরই অংশ তা তিনি প্রমাণ করেছেন।

এক সময়ে তিনি তাঁর প্রিয় প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য পদ্মপাদকে বলেছিলেন— কোনো বিদ্যা বা সাধনা কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত না হলে তা কখনো চিরস্থায়ী হয় না। তিনি তাই বেদান্ত শাস্ত্রকে বিশ্বে স্থায়ী আসন দেওয়ার জন্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতের চারপ্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। যেমন--- উত্তরে জ্যোর্তিমঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরি মঠ, পুবে গোবর্ধন মঠ এবং পশ্চিমে সারদামঠ। তিনি এও নির্বাচন করে যান কে কোন মঠের প্রধান হবেন। তোটক, সুরেশ্বর, পদ্মপাদ ও হস্তামালক হবেন চতুর্মঠের চার প্রধান মঠাধীশ। আর বাকি শিষ্যরা হবেন তাদেরই সহকারী। এইভাবে প্রথম ধাপে আচার্যদেব ভারতভূমির দিকে চার ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। চারটি মঠের কথা যে উপরে বলা হলো তা সহজভাবে বললে হয়--- বদরিকাশ্রম, রামেশ্বরধাম, পুরী বা পুরুষোত্তম ধাম ও দ্বারকা। দশনামী সম্প্রদায় এই শিবাবতারেরই সৃষ্টি। যেমন— গিরি, পর্বত, সাগর, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, বন, অরণ্য, তীর্থ ও আশ্রম। এই দশটি সম্প্রদায় চারটি মঠের অধীনে থাকবে এবং তাদের নিয়ম ও নির্দেশানুসারে ধর্মানুষ্ঠান করবে। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন তিনি। তাই দেখা যায় মঠ পরিচালনার জন্য তাঁর প্রবর্তিত অনুশাসনই সর্বত্র চালিত হয়। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য এই চারটি মঠের অধ্যক্ষদের এখনো 'শঙ্করাচার্য' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই শঙ্করাচার্যের আসনে অভিষিক্ত তিনিই হবেন যিনি পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, বেদ, বেদান্তশাস্ত্রে পারঙ্গম, সর্বশাস্ত্রবিদ, যোগারূঢ় সন্ন্যাসী। স্বামী শিবানন্দ একসময়ে সঙ্ঘের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন— 'প্রীতি, উদারতা, পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতা হচ্ছে সঙ্ঘ সৌধের ভিত্তি প্রস্তর। এদের কোনো একটির কমতি পড়লেই সঙ্ঘ

হবে দুর্বল।' (আদিকথা-পৃ. ৬২)

এক আচার্যের অবদানে তাঁর স্থানে উক্ত লক্ষণযুক্ত সন্ন্যাসীকেই নির্বাচন করতে হবে। তাঁর দায়িত্ব মানুষ বিরুদ্ধ ধর্ম আচরণ করছে কিনা দেখার জন্য মঠের আচার্যরা নিজস্ব এলাকাভুক্ত প্রান্তে সবসময় ভ্রমণরত থাকবেন। মনে রাখতে হবে, তেমন স্থায়ীভাবে মঠে বাস করার কোনো রীতি ছিল না।

মাত্র ৩২ বছর সময়কালে তিনি যা করেছিলেন তা বর্তমানের কোনো পণ্ডিত বা গবেষক বিস্ময়বোধ করেন। সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন শুধু নয়, তাকে নবজীবনদান করেছেন। এছাড়া বেদান্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারদান এবং হিন্দুশাস্ত্রকে তিনি শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন করেছিলেন। যে পঞ্চমহাযজ্ঞ বিস্মৃত হয়ে ছিল তাকে তিনি নতুন করে প্রবর্তন করলেন।

মেধা বা জ্ঞানের দ্বারা যে চতুর্মঠ রক্ষা করা যাবে না তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যেমন একটি সুনির্দিষ্ট রাজপথে সব কিছুকে পরিচালিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তেমনি তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এক অখণ্ড ভারতবর্ষে একটি কল্যাণকারী স্বর্ণ প্রতিমা গড়তে চেয়েছিলেন তা কালের গহ্বরে কোথায় যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। সেই সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাবে দেশ যেমন অরাজকতায় ভরে গিয়েছিল তা তিনি সুকৌশলে রক্ষা করেছিলেন। আসলে বৌদ্ধমতের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে একটা পূর্ণ ধারণা তাঁর মধ্যে ছিল। তাই তিনি মানব হয়েও অতি মানব। লোকবাসী হয়েও লোকোত্তর। যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন 'বিবেকচূড়ামণি'তে— 'অহেয় মনুপাদেয়ং মনোবাচামগোচরম্ অপ্রমেয় মনাদ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণমহং মহঃ' (বি. চু. পৃ. ২৮০)। এর অর্থ হলো— 'অত্যাজ্য, অনুপাদেয়, বাক্যমনাতীত, অপ্রমেয়, অনাদি, অনন্ত তেজঃ স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মই আমি। আবার 'স্তবকুসুমাঞ্জলি'র নির্বাণষট্‌কমে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এক স্বরূপ। সেখানে বৈদান্তিক বলছেন—

'ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভ মোহৌ<br>
ন মে বৈ মদো নৈব মাৎসর্যভাবঃ।<br>
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষঃ<br>
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।'

(অর্থ : আমার অনুরাগ ও বিরাগ নাই, আমার লোভ ও মোহ নাই, আমার অহংকার ও মাৎসর্য নাই, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নাই; আমি চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব)।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রচনার এক স্থানে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে এক চমৎকার উক্তি করেছেন— 'তিনিই (ভগবান) আবার আবির্ভূত হলেন। এবার তাঁর আবির্ভাব হলো দাক্ষিণাত্যে। সেই লোকত্তর প্রতিভার অধিকারী শঙ্করাচার্যের, সেই ব্রাহ্মণ যুবকের, যাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে যোলো বছরের মধ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত গ্রন্থের রচনা শেষ করেছিলেন। এই যোড়শবর্ষীয় বালকের রচনা, এই বালক নিজেও আধুনিক সভ্যতার চোখে পরম বিস্ময়।'

আদি শঙ্করাচার্যের জীবনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থান এবং প্রচার প্রসার। একাজ যে কত দুঃসাধ্য ছিল তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। তাঁর জীবনে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের অনুপম সম্মিলনকে দৈবী কৃপা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তাঁর রচিত কবিতা সংস্কৃত সাহিত্যে এক মনোরম বস্তু। পৃথিবীতে কে এমন আছেন 'ভজ গোবিন্দম্' স্তোত্র শুনে যার মনময়ূর ভাবরসে পূর্ণ না হয়? তিনি ছিলেন সাধন-সাম্রাজ্যের সম্রাট। ভগবতী 'ত্রিপুরা'র অনন্য উপাসক ছিলেন তিনি। মঠসমূহে শ্রীবিদ্যানুকুল দেবী পূজার যে প্রবর্তন করেন সেই পূজার্চনার পরম্পরা আজও অক্ষুণ্ণভাবে চলে আসছে।

শঙ্করাচার্য প্রমাণ করে গেছেন—

'কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা ত্রেতায়াং ঋষি সত্তমঃ।<br>
দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবামাহম্।।'

অর্থাৎ হলো সত্যযুগে ব্রহ্মা বিশ্বগুরু, ত্রেতাযুগে মহর্ষি বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস এবং কলিতে আমি বিশ্বগুরু।'

সমস্ত পৃথিবীতে অদ্বৈত-বেদান্তের যে অনির্বাণ শিখা তিনি প্রজ্বলিত করে গেছেন শত শত বছর যাবৎ তা আজও অম্লান হয়ে রয়েছে এবং প্রলয়কাল অবধি থাকবে।

'শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানামালয়ং করুণাকরম্।<br>
নমামি ভগবৎপাদং শঙ্করং লোকশঙ্কারম্।।'


## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

# রবীন্দ্র মূল্যায়নে অসফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

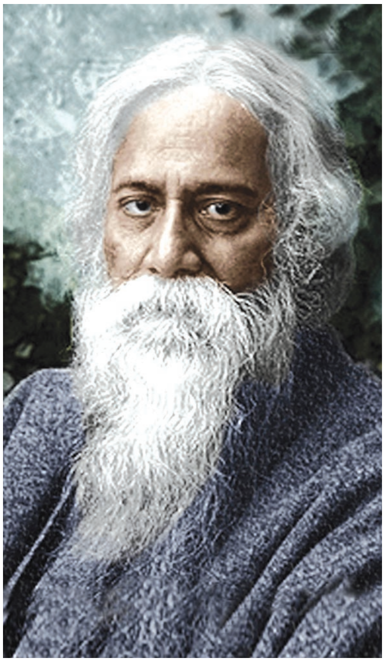

**ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি**

এক সময়ের ‘প্রাচ্যের অক্সফোর্ড’, বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু ১৯২১ সালে ফিলিপ জোসেফ হারটগকে উপাচার্য করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ আসেন ১৯২৬-এর ১০ ফেব্রুয়ারি, তখন তিনি ভুবনজয়ী কবি। সাহিত্যে এশিয়ার প্রথম নোবেল প্রাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ১০ ফেব্রুয়ারি ও ১৩ ফেব্রুয়ারি মাত্র দুদিন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। অসুস্থতার জন্য তাঁর কয়েকটি কর্মসূচি স্থগিত হয়ে যায়। ১০ আগস্ট তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছাত্র ইউনিয়নে দুটো লিখিত বক্তৃতা দিলেন— ‘The Rule of the Giant’ ও ‘The Meaning of Art’। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে তিনি লিখলেন বিখ্যাত এই গান— ‘এই কথাটি মনে রেখো,/তোমাদের এই হাসি খেলায়/আমি যে গান গেয়েছিলেম/ জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।’ এই গান অবশ্য কোনো অজানা কারণে পরে ১৯৮১-এ জগন্নাথ হলের হীরক জয়ন্তীর সময় প্রকাশিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তা মূলত ছাত্র সংসদের উদ্যোগে। ছাত্র সংসদের অনুষ্ঠানে কবি যখন বক্তৃতা করেছিলেন তখন সম্ভবত নিয়ম রক্ষার্থে সভাপতিত্ব করেছিলেন উপাচার্য জিএইচ ল্যাঙলি। এমনকী রবীন্দ্রনাথের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান কোথায় হবে তা নিয়েও দ্বন্দ্ব ছিল। হয়তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চোখা আক্রমণ করেছিলেন বলেই ব্রিটিশ পরিচালিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় প্রতিবাদী কবির প্রতি এমন ঠান্ডা অভ্যর্থনা!

১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার এএফ রহমান এবং রেজিস্ট্রার নাজিরুদ্দিন আহমেদ রবীন্দ্রনাথ-সহ আটজনকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাকি সাতজন হলেন— ১. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যার জন অ্যান্ডারসন, ২. স্যার আবদুর রহিম, ৩. স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, ৪. স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৫. স্যার যদুনাথ সরকার,

ফঃ ৫

৬. স্যার মুহম্মদ ইকবাল, ৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ এলেন না ডিলিট নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫-এ তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট নিয়েছেন। কিন্তু ঢাকা এলেন না অসুস্থতার কথা বলে। যদিও ১৯৩৬ নয়, ১৯৩৭-এ তিনি অসুস্থ হন। ১৯১৩-র নোবেল প্রাপককে এতো দেরী করে সাম্মানিক ডি.লিট দেওয়ার জন্য কি এই ক্ষোভ? নাকি উপরোক্ত অন্য সাতজনের সঙ্গে সাম্মানিক ডি.লিট প্রাপ্তি তাঁর মতো মহাজাগতিক প্রতিভার কাছে অমর্যাদার মনে হয়েছিল? যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর আগে আরও কয়েকজনকে সাম্মানিক ডি.লিট প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন সময়ের ডিগ্রি প্রাপকদের মধ্যে আছেন আর্ল অব রোলান্ডস, জোসেফ হারটগ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। ১৯২৬ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তখন তো পৃথিবীর এই মহত্তম কবিকে সাম্মানিক ডি.লিট দেওয়া যেত। কিন্তু তা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের কিছু পর দেশভাগ। ইসলামিক পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথকেই বর্জনের আহ্বান জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আলি আহসান। ১৯৫১-তে 'মাহে নও' পত্রিকায় তাঁর অভিমত 'আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে রাজি আছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতি এই মুহূর্তে প্রয়োজন।'

পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী শাসকেরা রবীন্দ্রনাথকেই বর্জন করতে চাইলে ১৯ জন বুদ্ধিজীবী বিরোধিতা করেন। আবার এঁদের মুক্ত চিন্তার বিরোধিতা করে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, কেএমএএ মুনিব, মহম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রভৃতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন অধ্যাপক বিবৃতি দিলেন। তাঁদের মূল অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অপূর্ব সংসদ', 'ক্রান্তি' ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সংগঠন মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথেই খুঁজে পেলেন। পাকিস্তানের অধীনে চব্বিশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবই সক্রিয় ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হলে রবি-গান হলো জাতীয় সংগীত। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শীতল কখনো-বা ঋণাত্মক মনোভাবে ভাটা পড়েনি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সামান্য পরে ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আহমেদ শরিফ পূর্বজদের মনোভাবকেই আরও বলিষ্ঠ করতে চাইলেন— 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্পদ নন। তাঁর সাহিত্য বাঙ্গালির অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের বিরূপ মনোভাব বড়ো কর্কশ। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করলেন নির্লজ্জ সংকীর্ণতায়। ১৯৮৬ সালে 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মের রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন— 'ভূতে ভগবানে ছিল তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) সমান বিশ্বাস। আমৃত্যু ভৌতিক প্ল্যানচেটে ছিল তাঁর গভীর আস্থা। আর কে না জানে এ ধরনের আস্তিকতা মানস মুক্তির একটা বড়ো অন্তরায়। রক্ত মাংসের মানুষ রবীন্দ্রনাথ কামে প্রেমেও উদাসীন ছিলেন না কখনো।'

প্রবন্ধটির শেষাংশে বলা হয়--- 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যক্ত-অব্যক্ত, সত্য-মিথ্যা, লঘু-গুরু অনেক অনুযোগ অভিযোগ রয়েছে। খোঁজও মিলেছে তাঁর অনেক অপূর্ণতার ও ত্রুটির।' কিন্তু প্রশ্ন হলো পৃথিবীর কেউই অপূর্ণতা ও ত্রুটি মুক্ত নয়। প্রাবন্ধিক খুঁজে খুঁজে শুধু রবীন্দ্রনাথই এমন অপূর্ণতা ও ত্রুটি পেলেন? আসলে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু বলেই এমন বিরোধিতা। বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্য ত্রুটিহীন নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি মহাজাগতিক বিস্ময় হন, নজরুল নিতান্তই সীমায়িত আলো। কিন্তু আক্রমণ তো রবীন্দ্রনাথকেই করতে হবে। তাঁর নাম তাই আক্রমণের লক্ষ্য হয় নানা ভাবে। বারেবারে। তা সে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ হোক।

এহো বাহ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আফতার আহমাদ 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথের গান জাতীয় সংগীত হিসেবে যে বিবেচিত হতে পারে না, তা জানাতে মুক্তকচ্ছ হয়েছিলেন। জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা'-র সৃষ্টির শতবর্ষ এক প্রকারে নীরবেই বাংলাদেশে অতিক্রান্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এক্ষেত্রে একেবারেই নিশ্চুপ।

রবীন্দ্রনাথ তো মানবতার চেতনার রং। পূর্ববঙ্গকে নিয়ে তাঁর বিপুল সাহিত্যকীর্তি। তাঁকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার দায় তো ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। বাংলা বিভাগ ও সংগীত বিভাগ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি বিপন্ন। আরও এক ভয়াবহ তথ্য আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে ১৯২১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ১৭৭ জন পিএইচডি হয়েছেন। এঁদের মধ্যে মাত্র চারজন রবীন্দ্র গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে নানা 'গবেষণা পত্রিকা' থাকলেও কোথাও রবীন্দ্র সংখ্যা নেই! জাতীয় সংগীতের রচয়িতার নামে কোনো চেয়ারও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। কেন এতো উপেক্ষা? কেন ভুলিয়ে দেওয়ার এত ব্যর্থ অপপ্রয়াস? রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় হিন্দু বলেই সমস্যা। স্পষ্ট কথায় তিনি বিধর্মী— বিশেষত হিন্দু। এবার তো লুঠতরাজের সময় জেহাদিদের দ্বারা তাঁর মূর্তি ভাঙা বাংলাদেশে একটি ভয়াবহ সংস্কৃতি হয়ে ওঠে। তবে এও সত্যি, কিছু মুক্তমনের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে এই প্রতিকূলতায়ও বাঁচিয়ে রেখেছেন। হুমায়ুন আজাদ মোল্লাবাদীদের হাতে নিহত হওয়ার আগে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতায় অস্বীকার করতে গিয়ে অন্তর্গত সত্তাই রবীন্দ্রময় হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হতে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই ব্রাত্য। অন্যদিকে মুক্ত পৃথিবীতে কবি ও দার্শনিক হলেন চিন্তার স্বরূপ, প্রতিবাদের ভাষা, ব্যানারের ক্যাচলাইন— বিশ্বাসের ধ্রুবতারা। রবীন্দ্রনাথ গোটা বিশ্বের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমশ সংকীর্ণ হতে থাকা পরিমণ্ডলে তাঁকে মুছে ফেলার অপপ্রয়াসে যতই তীব্র হোক আবিশ্ব, তাঁর অপরিসীম সৃষ্টিশীলতাকে ঢেকে রাখা যাবে না। □

# রাজ্য সরকার অযোগ্যদের বাঁচাতে যোগ্য শিক্ষকদের বলি চড়াল

**আনন্দ মোহন দাস**

'এগিয়ে বাংলা'। ইতিমধ্যে সকলে জেনে গেছেন ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে বৃহত্তম নিয়োগ দুর্নীতি ধরা পড়েছে এই রাজ্যে। রাজ্যের শাসকদল তথ্য প্রমাণ লোপাট করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। শিক্ষকদের মান মর্যাদা, সামাজিক সম্মান ও শ্রদ্ধাকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীকে পথে বসিয়েছে। সম্পূর্ণ শিক্ষককুলকে কলঙ্কিত করে যোগ্য অযোগ্যের বেড়াজালে শিক্ষক সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে সকলে জানতে পারলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অভূতপূর্ব দুর্নীতির ফলে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলো। হাইকোর্ট শিক্ষা পর্ষদ, স্কুল সার্ভিস কমিশন ও রাজ্য সরকারকে শিক্ষক নিয়োগে কারচুপি ও ঘোটালার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করছে। রাজ্য সরকার যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের পৃথক না করে দেওয়ায়, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অসাধু উপায় অবলম্বন করে শিক্ষক নিয়োগের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হলো।

রাজ্যের দুর্নীতির মুকুটে আরেকটি পালক যুক্ত হলো। একদা শিক্ষা, শিল্পে সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির সঙ্গে আজ দুর্নীতি শব্দটি যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। এর আগে শাসকদলের বদান্যতায় বালি, কয়লা, গোরু, পাথর, রেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে চুরি করে শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের পকেট ফুলেফেঁপে উঠেছে। এই অভিযোগের নিষ্পত্তি আজও আদালতের কাঠগড়ায় আটকে রয়েছে। কয়েকজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা জেলের ভাত খেয়ে বর্তমানে জামিনে বাইরে রয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাসকদল কোনো রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কারণ দলের উঁচু থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সকলেই কোনো না কোনো ভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এরাজ্যে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।

জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাকে ভেঙে দেওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছে শাসকদল। কারচুপির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একসঙ্গে প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি চলে যাওয়ার ফলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ অবস্থা। এত সংখ্যক ব্যক্তির চাকরি চলে যাওয়ার অর্থ প্রায় লক্ষাধিক লোক নিশ্চিতভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন। এই ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষক যোগ্য অযোগ্যের বিভাজনে নিজেদের আত্মসম্মান নিয়ে চাকরি করতে দ্বিধাবোধ করছেন। তাই আন্দোলনকারীরা বলছেন, মাইনের চেয়ে আমরা আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই। উচ্চ শিক্ষিত যোগ্য শিক্ষকরা যাঁরা যোগ্যতা অর্জন করে শিক্ষকতা করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অযোগ্যদের মিশিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকার প্রকৃত শিক্ষকদেরও সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

একটু পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০১৬ সালে প্রায় ২২ লক্ষ চাকরি প্রার্থী নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক এবং গ্রুপ সি পদের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পরীক্ষায় বসেছিলেন। সেই সময় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের শূন্য পদের সংখ্যা ছিল ২৪,৬৪০টি, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে শূন্য পদের সংখ্যা বেড়ে ২৫,৭৫৩ হয়ে যায় এবং সেই মতো ২৫,৭৫৩ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে তথ্য প্রমাণ-সহ কলকাতা হাইকোর্টে বঞ্চিতরা মামলা করেন।

আদালতের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি তৈরি হলো এবং তাঁরা প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে আদালতে রিপোর্ট পেশ করলেন। কলকাতা হাইকোর্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির তদন্তে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইকে নিযুক্ত করল। সিবিআই তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর খাটের তলা থেকে নগদ ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করল। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় নামে বেনামে অনেক সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গেল। শিক্ষামন্ত্রী-সহ গোটা শিক্ষা দপ্তর জেলে চলে গেল। যে রাজ্যে পুরো শিক্ষা দপ্তর জেলে, সেখানে শিক্ষার কী অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে টাকা সংগ্রহ করার অপরাধে জেলায় জেলায় তৃণমূলের নেতারা সিবিআইয়ের হাতে ধরা পড়তে লাগলো। ইডি ও সিবিআই তদন্তের জালে অনেকে জড়িয়ে গেলেন। যদিও এখন পর্যন্ত এই মামলা আদালতে বিচারাধীন।

> **বর্তমান প্রজন্মের কাছে শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হলো। রাজ্য সরকার অযোগ্যদের বাঁচাতে গিয়ে যোগ্য শিক্ষকদের বলি চড়াল**

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়ে ৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর দুর্নীতির দায়ে অযোগ্য ঘোষিত হয়ে চাকরি বাতিল হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে এবং সুপ্রিম কোর্ট সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়ে মামলাটির শুনানির জন্য কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে স্থানান্তরিত করে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাবে এবং যোগ্য অযোগ্য সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়ায় ডিভিশন বেঞ্চ সম্পূর্ণ

প্যানেলটি বাতিল ঘোষণা করে রায় দেয়। যার ফলে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী মিলে একজন বাদে ২৫,৭৫২ জনের চাকরি চলে যায়।

এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার পুনরায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের কাছে যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা জমা করার আদেশ দেয়। কিন্তু দীর্ঘ টালবাহানার পরেও পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশন সঠিক তালিকা জমা দিতে অক্ষম বলে জানায়। কারণ হিসেবে পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশন সঠিক তালিকা জমা দিতে অক্ষম বলে জানায়। কারণ হিসেবে পর্ষদ আদালতে জানায়, পরীক্ষার ওএমআর শিট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার স্ক্যান কপিও সংরক্ষণ করা হয়নি। তার ফলে গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ বাধ্য হয়ে স্বচ্ছতার অভাবে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় বহাল রাখেন। যার ফলে প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক ও গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মচারী চাকরি হারালেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি বাতিলের পরিসংখ্যানটি হলো নিম্নরূপ :

১. ২০১৬ সালের এসএসসি-র মোট নিয়োগপত্র = ২৫,৮৪৪।

২. তার মধ্যে যে মোট নিয়োগ = ২৫,৭৫৩।

৩. ইনসার্ভিস = ৪২৫ (এঁরা আগের কর্মস্থলে যোগদান করতে পারবেন)।

৪. ইনসার্ভিস বাদে মোট নিয়োগ = ২৫,৭৫৩-৪২৫ = ২৫,৩২৭।

৫. ক্যানসার রোগী সোমা দাসকে বাদ দিলে সংখ্যা দাঁড়ায় = ২৫, ৩২৭।

৬. সর্বমোট চাকরি বাতিল = ২৫,৩২৭।

এই ২৫,৩২৭ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অযোগ্য বিবেচিত হয়েছেন :

(ক) ওএমআর কারচুপি এবং র‍্যাঙ্ক জাম্প করে চাকরি পেয়েছেন = ৪,৩২৭।

(খ) এসএসসি-র সুপারিশ ছাড়াই চাকরি পেয়েছেন = ২,৮২৩।

(গ) প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও চাকরি পেয়েছিলেন = ১,১৭৪। মোট (ক) + (খ) + (গ) = ৮,৩২৪।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এই অযোগ্য চাকরি প্রাপকদের অবিলম্বে বার্ষিক ১২ শতাংশ সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে হবে। এছাড়াও সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগে নিম্নলিখিত কারচুপিগুলি সামনে উঠে এসেছে।

১. ওএমআর শিটে কারচুপি করা এবং তা পুড়িয়ে দেওয়া।

২. নম্বর বাড়িয়ে র‍্যাঙ্ক পরিবর্তন করা।

৩. ইন্টারভিউয়ের নম্বরে কারচুপি করা।

৪. এসএসসি-র রেকমেন্ডেশন ছাড়াই নিয়োগ করা।

৫. প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নিয়োগ করা।

৬. শূন্য খাতা জমা দিয়েও চাকরি পাওয়া।

এই সমস্ত অন্যায় কাজগুলি বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে করা হয়েছে যা সিবিআই ও ইডির তদন্তে উঠে এসেছে। ওএমআর শিটগুলির স্ক্যান কপি না রেখে পুড়িয়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ হলো, যাতে ভবিষ্যতে কেউ দুর্নীতির হদিশ করতে না পারে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো এই বিশাল পরিমাণ দুর্নীতির জন্য রাজ্য সরকার নিজেদের দায় স্বীকার না করে, কখনো বিজেপির ঘাড়ে, কখনো বঞ্চিতদের উকিলের ঘাড়ে, বিচারপতির বিরুদ্ধে এবং সুপ্রিম কোর্টকে দোষারোপ করে নিজে সাধু সাজছে। মুখ্যমন্ত্রী বলতে লাগলেন, 'ভাত দিতে পারে না, কিল মারার গোঁসাই।' একেবারে নির্লজ্জতার শেষ সীমায় পৌঁছালে তবেই কোর্টের রায় নিয়ে এই ধরনের মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে নিজেদের কিছু ধামাধরা ব্যক্তির উপস্থিতিতে কয়েকজন যোগ্য নামাঙ্কিত চাকরিহারাদের সামনে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন এবং প্ল্যান এবিসিডি তৈরি আছে বলে মিথ্যা আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু কি সেই প্ল্যান তিনি প্রকাশ করলেন না। তিনি আইনি পথে সমস্যা সমাধানের কোনো আশার আলো দেখাতে পারলেন না। কেবলমাত্র বিরোধীদের উপর দোষ চাপানো এবং নিজেদের সাফাই গাওয়ার জন্য সমাবেশটিকে বেছে নিলেন।

কখনো শিক্ষামন্ত্রী আলোচনায় যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবেন বলে আশ্বাস দিচ্ছেন, আবার পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের দোহাই দিয়ে তালিকা প্রকাশ না করার কথা বলছেন। সুতরাং সরকার যে তালিকা বের করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা চায় না, তা তাদের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গাঙ্গুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যোগ্য অযোগ্যের তালিকা প্রকাশের বিষয়ে কোনো রকম বাধা নেই। প্রকৃতপক্ষে সরকার ও পর্ষদের সদিচ্ছা নেই বলেই এই ধরনের অজুহাত খাড়া করা হচ্ছে। অথচ সাংবাদিক সম্মেলনের শিক্ষামন্ত্রী জানালেন শিক্ষকদের মাহিনার জন্য ১৭,২০৬ জন যোগ্যের তালিকা ডিআই অফিসে পাঠানো হয়েছে। তাহলে যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে অসুবিধা কোথায়? তাহলে এর পিছনে কি অন্য কাহিনি রয়েছে? সুতরাং সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী অশিক্ষক কর্মচারী বা শিক্ষাকর্মীরা স্কুলে যোগ দিতে পারবেন না।

এই তালিকা প্রকাশের দাবিতে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা আন্দোলনে নেমেছেন। সারা রাত জেগে গরমে কষ্টের মধ্যেও যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করতে এবং নিজেদের সম্মান পুনরুদ্ধারে যোগ্য শিক্ষকরা কখনো শিক্ষা দপ্তরের সামনে, কখনো পর্ষদের সামনে ধরনা ও অনশন করে চলেছেন কিন্তু নির্লজ্জ সরকারের দিক থেকে কোনোরকম ইতিবাচক সাড়া নেই। এমনকী যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে শিক্ষকদের পুলিশের লাঠিপেটা ও লাথিও খেতে হয়েছে। কারণ শাসকদলের ভয় রয়েছে, যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হলেই অযোগ্যরা ঘুষের টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য তৃণমূল নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করবে এবং কোর্টের নির্দেশে এতদিনের মাহিনার টাকা ফেরত দেওয়ার বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করবে। তাই তালিকা প্রকাশ না করেই যোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে যোগ দেবার কথা বলে চলেছে। ইতিমধ্যে গত ১৭ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে স্কুলে পড়াশোনা চালু রাখতে যোগ্য শিক্ষকদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বা নতুন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হওয়া পর্যন্ত স্কুলে চাকরি করতে পারবেন বলে সংশোধিত আদেশ জারি করেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি অশিক্ষক কর্মচারীরা চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে রাজ্য সরকার সামরিক স্বস্তি পেলেও যোগ্য শিক্ষকরা একেবারেই খুশি নয়। এই ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর ভবিষ্যৎ যেমন ঝুলে থাকল, সেরকম রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলো। পশ্চিমবঙ্গের বুকে শিক্ষাক্ষেত্রে এই অচলাবস্থা কবে কাটবে তাতে প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে গেল। বর্তমান প্রজন্মের কাছে শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হলো। রাজ্য সরকার অযোগ্যদের বাঁচাতে গিয়ে যোগ্য শিক্ষকদের বলি চড়াল যা কখনোই কাম্য নয়। □

# বেছে বেছে হিন্দু হত্যা : মুর্শিদাবাদ হোক বা কাশ্মীর

**বিপ্লব বিকাশ**

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জেহাদিরা পর্যটকদের ধর্ম জিজ্ঞেস করে বা কলমা পড়তে বলে। হিন্দু পরিচয় মিলতেই ২৬ জনকে হত্যা করে। এই ঘটনায় শুধু ভারত নয়, আমেরিকা, ইজরায়েল, রাশিয়াও উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশ, বেলডাঙ্গা, মালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বা মুর্শিদাবাদ–– মানুষ আলাদা হলেও নিশানা এক— হিন্দু! মুসলমানদের আসার সময় থেকেই বাঙ্গালি হিন্দুরা তাদের আক্রমণের শিকার। সময়, শাসক, অজুহাত পালটেছে কিন্তু লক্ষ্য–– হিন্দুদের নিঃশেষ করা।

এই সত্যটা অনেকের কাছে অস্বস্তিকর হলেও অস্বীকার করা যায় না। ইহুদিদের পর সম্ভবত বাঙ্গালি হিন্দুরাই সবচেয়ে বেশি এথনিক ক্লিনজিং-এর শিকার। বিগত সাত-আট দশকে 'দাদা' আর 'দিদির' দল মিলে এক ভয়ংকর রাজনৈতিক মডেল তৈরি করেছে— 'বেঙ্গল মডেল'। এই মডেল বিচার করা এখন পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের দায়িত্ব। ১১ এপ্রিল ২০২৫, জুম্মার নামাজের পর শুরু হয় বিক্ষোভ। দাবি ওঠে–– 'ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহার চাই'। এরপর শুরু হয় সংগঠিতভাবে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ। আবেগ ছিল না, বরং পরিকল্পিত হামলা। সাংবাদিক পঙ্কজ প্রসূনের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগে থেকেই হিন্দুদের বাড়িতে কালো চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল, তারপর বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, মন্দির ভাঙচুর। পুলিশে ফোন করেও লাভ হয়নি, প্রশাসন চুপচাপ থেকেছে। এটা কি কেবল গাফিলতি, নাকি 'রাজনৈতিক বার্তা'?

হিন্দুরা নিজের ভিটে ছেড়ে সপরিবার শরণার্থী হতে বাধ্য হলো, মহিলারা নির্যাতনের শিকার, মন্দিরে হামলা, সব কিছু মিলে স্পষ্ট এটা এক গভীর ষড়যন্ত্রের ছবি। এটাই 'বেঙ্গল মডেল'–– যেখানে তুষ্টীকরণ আর প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা মিলিয়ে গড়ে উঠেছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক সাংস্কৃতিক ও মানসিক সন্ত্রাসের ছক।

এই মডেল এক ধরনের রাজনৈতিক জোট। একদিকে একটি মজহবি গোষ্ঠী যাদের ভোট একটি নির্দিষ্ট দল পায়, অন্যদিকে সেই দল সেই গোষ্ঠীর আনুগত্য বজায় রাখতে বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, এমনকী সংবাদমাধ্যমকেও নিয়ন্ত্রণ করে। ফলাফল? হিন্দুদের উপর হামলা এবং প্রশাসনের চোখ বন্ধ করে থাকা। আর তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা 'দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ' বলে ঘটনাকে ধামাচাপা দেয় এবং সম্প্রীতির একপাক্ষিক বার্তা দিয়ে বাঙ্গালি হিন্দুর মনে ভ্রম উৎপন্ন করে। হিন্দু রক্ষার কথা বললে হেয় দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন, জেহাদিদের আক্রমণ নিয়ে কোনো স্পষ্ট কথা বলবে না।

এই বঙ্গভূমিতেই তো ভারতীয় নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। এই বঙ্গপ্রদেশেই তো একসময় মানুষ রোজগারের আশায় আসতো! সেই 'বঙ্গ মডেল' থেকে দাদা-দিদির তৈরি 'বেঙ্গল মডেল'-কে গুলোবেন না, প্লিজ। আজ সেই বঙ্গ কোথায় পৌঁছেছে? মজহবি মোল্লাবাদ, প্রশাসনিক পক্ষপাত এবং হিন্দুদের উপর নিপীড়ন অব্যাহত। আজ পশ্চিমবঙ্গে 'হিন্দু' হয়ে বেঁচে থাকা যেন এক রাজনৈতিক অপরাধ! ভোট পাওয়ার আশায় রাজনীতি এতটাই অন্ধ হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বরকেই স্তব্ধ করার প্রয়াস চলছে।

অবিলম্বে কী করা উচিত?

১. মালদহ ও মুর্শিদাবাদকে বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলে রূপান্তর করার প্রস্তাব বিবেচনা করা উচিত, যাতে সেখানে জনসংখ্যার ভারসাম্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

২. সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।

৩. মুর্শিদাবাদ ও মালদহর সাম্প্রতিক জেহাদিদের আক্রমণে ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। এই দুটি জেলায় জেহাদি সন্ত্রাস দমন ও হিন্দু নির্যাতন থামাতে 'উপদ্রুত অঞ্চল' হিসেবে জেলাদুটিকে ঘোষণা করতে হবে।

৪. অন্য দেশ ও রাজ্যের যারা বেআইনিভাবে বসবাস করছে, তাদের ভোটাধিকার অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। কারণ এই অবৈধ ভোটই হিন্দু সমাজের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছে।

এই দাবিগুলো শুধু প্রশাসনিক নয়, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। আজকের 'বেঙ্গল মডেল' এক ভয়ংকর বাস্তবতায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে হিন্দু পরিচয়টাই যেন অপরাধ। আক্রমণের আগে চিহ্ন দেওয়া হয় হিন্দুদের বাড়িতে, আর প্রশাসন চুপ। এটা শুধু রাজনীতি নয়, এটা সাংস্কৃতিক নিধনের চক্রান্ত। বাঙ্গালি হিন্দু আর কতকাল চুপ থাকবে? নিজের ভূমিতে আজ হিন্দু হয়ে বাঁচাও বিপজ্জনক! শোষণ, তুষ্টীকরণ, পরিকল্পিত হত্যা, সব কিছু শুধুই হিন্দু পরিচয়ের জন্য। এখন না জাগলে কাল সবার দরজায় থাকবে সেই চিহ্ন— কালো দাগ।

সাধু সাবধান! কারণ তারা জানে আপনি কে–– আপনি হিন্দু, তাই আপনি তাদের লক্ষ্য। □

গল্প

নবাঙ্কুর

# কাঁচা আম

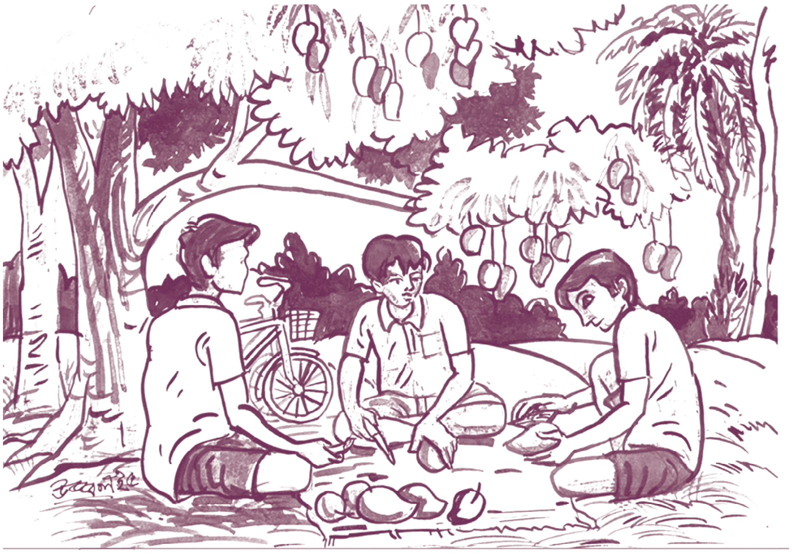

শনিবারে তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হতেই রতন আর গোবিন্দ একটা সাইকেলে রওনা হলো সঞ্জয়দের বাড়িতে। আজকে সে স্কুলে যায়নি। শরীর খারাপ হলো নাকি কে জানে! সাইকেলে হাওয়া একটু কম ছিল, বাজারে শ্যামলকাকার দোকান থেকে হাওয়া ভরে নিয়ে সঞ্জয়দের বাড়ি পৌঁছে ডাক দিতেই একটা বাটিতে কিছু খেতে খেতে সঞ্জয় বেরিয়ে এল।

বেড়ার ধারে সাইকেলটা রেখে বাড়ির ভেতরে ঢুকে রতন বলল, আজকে স্কুলে যাসনি কেন? সঞ্জয় তখন কাঁচালঙ্কা, তেল, লবণ দিয়ে মাখানো কাঁচা আম সমানে খেয়েই চলছে আর ঝালের জন্য উঃ উঃ করছে, কিন্তু খাওয়া বন্ধ করছে না। শেষ টুকরোটা মুখে দিয়ে বলল, আজকে শরীরটা ভালো ছিল না, তাই যাইনি।

গোবিন্দ বলে, কোথায় তোর শরীর খারাপ? দিব্যিই তো সাঁটিয়ে আম খাচ্ছিস, এক টুকরোও তো দিলি না। সঞ্জয় দাঁত বের করে হাসি মুখে বলল, সকাল থেকে পেটব্যথা করছিল, এখন আমটা খেয়ে শান্তি পেলাম।

গোবিন্দ ফাঁকা বাটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের না দিয়েই খেলি, তোর হজম হবে না কিন্তু।

—ওঃ, তোরা খাবি তা আগে বলবি তো। চল কালকে সকালে গড়ের পিছনের বাগানে। প্রচুর আম ধরেছে।

রতন ঢোক গিলে বলল, গড়ে! ওখানে তো শুনেছি ভূত থাকে। তুই ওখানে গেছিলি নাকি?

ধুত, কোথায় ভূত? ওখানে প্রচুর কুল, খেজুর, আম, জাম, আতা, তালগাছ। খাওয়ার লোক নাই, শুধু পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। কালকে সকালেই চল। আর একটা ব্যাগ নিয়ে নিস। আমি নুন-লঙ্কা নিয়ে নেব। সকালেই চলে আসবি, বেলা বাড়লে রোদে গা পুড়ে যাবে। এখন বাড়িতে চল, আচার দিয়ে মুড়ি খাবি। তিন বন্ধু মুড়ি খেয়ে যে যার বাড়ি রওনা হলো।

পরেরদিন সকালেই তিনবন্ধু জমা হলো গ্রামের শেষপ্রান্তে, শ্মশানকালী মন্দিরের সামনে। কাগজের ঠোঙায় লবণ লঙ্কা নিয়ে, কোমরে গামছা বেঁধে সঞ্জয় তার বাবার সাইকেল নিয়ে চলে এসেছে। তারপর জমির আলের আঁকাবাঁকা পথ ধরে রওনা হলো। আধাঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে গড়ের ঢিবির কাছে পৌঁছে আমগাছের দেখা পাওয়া গেল। গড়ের কাছে অনেকগুলো গর্ত। সঞ্জয় বলল, এগুলোতে শেয়াল থাকে। সন্ধ্যার পর এখান দিয়ে কারুর একা যাওয়ার উপায় নাই। শেয়ালের দল ঘিরে ধরে। গোবিন্দ বলল, আমার তো এখনই যেতে ভয় করছে।

বড়ো একটা আমগাছের তলায় এসে, সাইকেল রেখে সঞ্জয় গামছাটা বিছিয়ে লবণ-লঙ্কার ঠোঙাটা রাখল। মাটিতে দাঁড়িয়ে হাত দিয়েই আম পাড়া যায়। আমের ভারে এক জায়গায় তো ডাল প্রায় মাটিতে ঠেকে গেছে। বড়ো দেখে কয়েকটা আম পেড়ে গামছার উপর রাখা হলো। সঞ্জয় পকেট থেকে একটা ঝিনুক বের করে পাথরে ঘসে একটা খোসাছোলা তৈরি করে ফেলল, তা দিয়ে আম ছুলে, ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে লবণ-লঙ্কা মাখিয়ে খাওয়া শুরু করল। ঝালটা বেশিই হয়েছে। গোবিন্দ একহাত দিয়ে চোখের জল মুছে আবার খেতে শুরু করল। রতন খাচ্ছে আর জিভ বের করে উফ্ আঃ করছে। সঞ্জয় কিন্তু পটাপট খেয়ে চলেছে।

খাওয়া শেষ করে গামছাতে আরও কিছু আম বেঁধে নিয়ে তারা বাড়ির দিকে রওনা দিল। রোদটা ভালোই চড়া। গোবিন্দ মাথায় একটা কচু পাতা দিয়ে ঢেকে সাইকেলে উঠে পড়ল। জমির আল দিয়ে কিছু দূর চলার পর হঠাতই বড়ো বড়ো ঘাসের জঙ্গল থেকে একটা শিয়াল আসতে দেখে রতন ঘাবড়ে গিয়ে সাইকেল সমেত মাটিতে পড়ে গেল। শিয়ালটাও ভয় পেয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেল, আর দেখায় গেল না। কোনোরকমে সাইকেল তুলে গোবিন্দ আর রতন পালাতে শুরু করে। রতন ততক্ষণে অনেকদূর চলে গেছে। শ্মশানকালী মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখা গেল রতন গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাসছে।

রতন একটুও না দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। গোবিন্দও তার পেছন পেছন রওনা দিল। সঞ্জয় শুধু একটা আম বের করে খেতে শুরু করল।

**সোমকান্তি**

জাতীয় উদ্যান

# ইরাভিকুলাম

ইরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান কেরালা রাজ্যের ইদুক্কি ও এর্ণাকুলাম জেলার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাশে অবস্থিত। এটি ৯৭ কিলোমিটার বিস্তৃত। এই উদ্যানের মূল অংশটি ২০০০ মিটার উচ্চতায় একটি মালভূমির উপর অবস্থিত। পুরো উদ্যানটির উত্তর-পশ্চিমে ঘন পুয়ামকুট্টি ইদামালায়ার বন দ্বারা বেষ্টিত। এই উদ্যানল ২৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জন্তু রয়েছে। তার মধ্যে নীলগিরি তাহরের সংখ্যা সর্বাধিক। অন্যান্য জন্তুর মধ্যে রয়েছে চিতল হরিণ, নীলগিরি ল্যাঙ্গুর, সিংহলেজওলা ম্যাকাক, গৌড়, লাল মুন্টজ্যাক, বুনোশুয়োর, সোনালি শেয়াল, ঢোল, বনবেড়াল, বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি। ১৩২ প্রজাতির পাখি এবং ১৯ প্রজাতির উভচর রয়েছে। এই উদ্যানের পর্বতগাত্রে নীলকুরিঞ্জি ফুল ফুটে অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

## এসো সংস্কৃত শিখি-৬৬

**कदा ?** – কখন? **काल:** – বেলা

**प्रत्युषे**–ভোরবেলা।

**प्रात:काले** – সকালে।

**मध्याह्ने** দুপুরে।

**अपराह्ने** -বিকেলে।

**सायंकाले** – সন্ধ্যায়।

**रात्रिकाले**–রাতে।

**अहं प्रात:काले उत्तिष्ठामि।**

আমি সকালবেলা উঠি।

**अभ्यासं कुर्म:**––

स: मध्याह्ने खादति। एषा आपराह्ने क्रीडति। भवान सायंकाले पठति समीर: रात्रिकाले निद्रां करोति।

## ভালো কথা

# পাখির জন্য জল

প্রতি বছরই বৈশাখ মাস পড়তেই ঠাকুমা আমাদের উঠোনের ধারে আমগাছের তলায় একটি মাটির সরায় পাখিদের জন্য জল রাখে। সারাদিনে অনেক পাখি জল খেতে আসে। কিন্তু সব পাখি একসঙ্গে আসে না। এক-এক পাখি এক-এক সময়ে আসে। বেশ কয়েকটা পায়রা জল খেয়ে সেই জলেই বেশ আয়েশ করে স্নান করে। সূর্য ডোবার আগে শালিক পাখি স্নান করে। তখন কয়েকটা ঘুঘুপাখি জল খেয়ে যায়।

**কাঞ্চন ঘোষ,** সপ্তম শ্রেণী, বালিগঞ্জ বন্ডেল রোড, কলকাতা-৩৯

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## শব্দের খেলা

*লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে*

(১) র র খ দা

(২) ক ন্ধ মু গ

*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*

(১) চ র ক ম ণ শ্রী যু লে

(২) ঘ ঘ ট ট ন ন অ প টী সী য়

**২১ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর**

(১) ফটিকজল (২) প্রাণনাশক

**২১ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর**

(১) প্রাণদণ্ডাদেশ (২) বন্যাকবলিত

**উত্তরদাতার নাম**

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদমপুর, মালদা। (২) শ্রেষ্ঠা দত্ত, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর।
(৩) দুর্গেশনন্দিনী হালদার, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (৪) সৌরভ বিশ্বাস, হাজরাতলা, শিমূলপুর, উঃ ২৪ পরগনা।

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

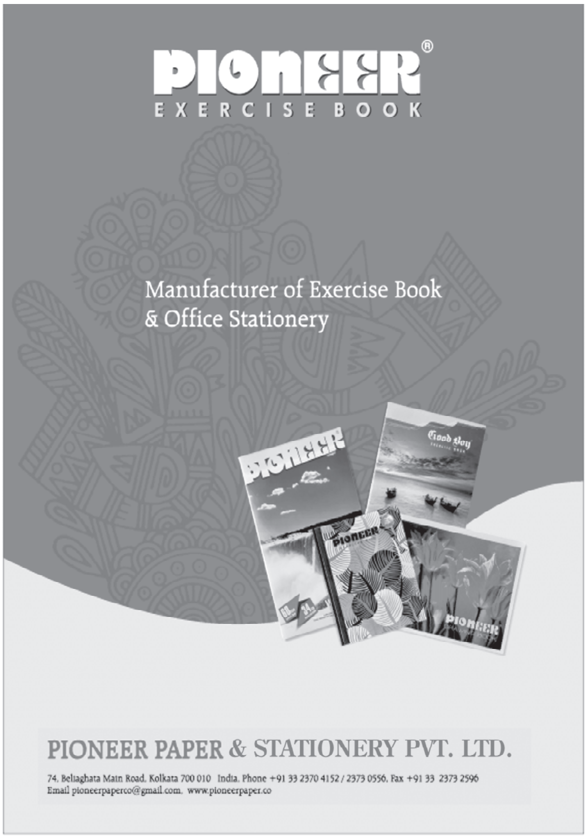


## নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

# মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

## কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

**DRS INVESTMENT** ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

# একটি মেয়ের কুড়িটি চিঠি

# মৃত্যুপুরীর সঞ্জীবনী

**একটি মেয়ে ৩৭ বছর বয়স। এখন সে পরিণত। এটা বুঝতে পারার জন্য যে মাত্র ৬ মাস বয়সে যখন সে মাতৃহারা হয়, যখন তার মায়ের ৩১ বছর বয়স। কী মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কষ্ট পাচ্ছিল তাঁর মা। তিনি মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন আর শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বামী সেই দেশের সবথেকে শক্তিশালী মানুষটিকে। সেই মানুষটি এই ৩৭ বছরের মেয়েটির বাবা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাধিনায়ক জোসেফ স্ট্যালিন।**

**প্রথম পর্ব**

**পিন্টু সান্যাল**

দেশের সবথেকে শক্তিশালী মানুষ হতে গিয়ে, ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে সে কাকে মারেনি? সন্দেহ যাকে হয়েছে, তাকেই নির্বাসনে পাঠিয়েছে। সন্দেহ হলেই 'শাস্তি'— হয় নির্বাসন নয়তো মৃত্যুদণ্ড। আর দেশের মানুষকে ঠকানোর জন্য লোকদেখানো বিচার আর অপরাধীর স্বীকারোক্তি। দেশের বা বলা ভালো সারা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তির মেয়ে হয়েও তার শৈশব কষ্টে ভরা। বাবা বলেই সে বাবাকে ভালো না বেসে পারে না, আবার বাবার অপরাধগুলোকেও না বলে পারে না। সবথেকে বড়ো অপরাধ তাকে মাতৃহারা করা।

শুধু কি তার মা? তার মাসি, মেসো, ভাই, আত্মীয়-পরিজন সবাই এই হত্যালীলার বলি হয়েছে। এমনকী বাড়ির চাকর পর্যন্ত হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কিন্তু হাজার হলেও বাবা তো! মন চায় না তার বাবাকে অপরাধী, গণহত্যাকারী বলতে। তাই বাবা বলে তার অপরাধকে বিশ্বের চোখে একটু কম দেখাতে, সেই গণহত্যাকারীকে প্যারানয়েড-এর রুগি বলেছে। দায় কখনো দিয়েছে তার বিশ্বস্ত কোনো আধিকারিকের ঘাড়ে, কখনো বলেছে তার বাবাকে ভুল বুঝিয়ে করানো হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো হত্যাকাণ্ডগুলিকে। কিন্তু, ইতিহাস ও তথ্যপ্রমাণ বলে অন্য কথা।

প্রতি পদে নিজের দলের কর্মী, দেশের স্বনামধন্য কবি, লেখক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক মেয়েটির বাবাকে ভুল ধরানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু ভুল ধরানোর সাজাই হচ্ছে মৃত্যু। তার মায়ের মৃত্যুর কারণ প্রায় ৩০ বছর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মেয়েটির থেকে। তার মা আত্মহত্যা করেছিল, তার মামার উপহার হিসেবে দেওয়া পিস্তল দিয়ে।

স্ত্রীর আত্মহত্যার পর একটিবারের জন্যও তার বাবা মায়ের সমাধি দেখতে যায়নি— আক্ষেপ মেয়েটির। সারা পৃথিবীকে সুখী করতে যে সমাজতন্ত্র রচনা করতে চায় তার বাবা, সেই মানুষটির আশেপাশে কেউ শান্তিতে থাকেনি। সবসময়ই এক ভয়ার্ত পরিবেশ। কার কখন ডাক আসে মৃত্যুর, কে কখন বন্ধু থেকে শত্রুতে পরিণত হয়। কে কখন সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ ভক্ত থেকে গণশত্রুতে অভিযুক্ত হয়। সে এক ভয়ের যুগ। সেই মৃত্যুপুরীর দরজা বন্ধ। বাইরে বেরোয় না কথা। কিন্তু দেওয়ালেরও কান আছে। তাতে কী, শুনতে পাওয়া সব কান, বলতে চাওয়া সব মুখ বলা-শোনার আগেই বন্ধ করে দিতে পারে তার পিতা, একটু সন্দেহ হলেই। অবাক করার বিষয় হলো, যে মানুষটি তার নিজের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলেছিল, লক্ষ লক্ষ কৃষককে অনাহারে থাকতে বাধ্য করেছিল, তার নিজের স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের জীবনকে দুর্বিষহ করেছিল, আত্মীয়-পরিজনকে শুধুমাত্র মৃত্যু দিয়েছিল, সেই মানুষটি আর তার মতাদর্শকে সামনে রেখে নতুন সমাজ রচনা করতে চায় একটি দল।

সেই মানুষটি; যার মেয়ে তার বাবার হত্যার কাহিনি বর্ণনা করেছে আর তার বাবার মতাদর্শ থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে নিজেকে, সেই মানুষটি নাকি একটি দলের নায়ক। শুধু মায়ের মৃত্যুই নয়, মেয়ের প্রেমিককেও নিরুদ্দেশ করে দেওয়ার কারিগর তার পিতা। এতসবের প্রয়োজন নাকি সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের জন্য। গোটা পৃথিবীর কোনো শিশু-কিশোর-তরুণকে তার মতো যন্ত্রণা

ফঃ ৬

যাতে না পেতে হয়, এই মতাদর্শের নামে হত্যালীলার কষ্টভোগ যাতে কোনো দেশের মানুষকে না করতে হয়, তার জন্য বিশ্বের সামনে নিজের কাহিনি তুলে ধরেছিল মেয়েটি।

বাবাকে সে ভালোবাসে— এ কথা বলেও তার বাবার অপরাধ সে নিজেই বলে গেছে ভবিষ্যতের পৃথিবীকে সুখী করার জন্য।

ইংরেজি শেখার চেষ্টায় ইংলিশ ও আমেরিকান খবরের কাগজ পড়তো মেয়েটি। হঠাৎ করে আবিষ্কার করলো, ১৯৩২ সালের ৮ নভেম্বর তার মা আত্মহত্যা করেছে। ছুটে গেল তার দিদিমার কাছে, জিজ্ঞাসা করলো কেন এতদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এই মর্মান্তিক ঘটনা? মনে করার চেষ্টা করলো ছোটোবেলার ঝাপসা হয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো। বড়োদের কাছে এই খবর পুরাতন কিন্তু মাত্র ৬ বছর বয়সে তার মা যেন তার সামনেই আত্মহত্যা করলো। মাতৃহারা মেয়ে, বিধ্বস্ত হলো ভিতর থেকে।

তার ৩৬ বছরের ব্যথা শোনার মতো আত্মীয় আশেপাশে কেউ নেই। ইচ্ছা ছিল সাহিত্য নিয়ে পড়বে। পিতার অনিচ্ছায় হয়নি। ১৯৬৩ সাল। পিতা মৃত। সেই একনায়ক আর নেই, সেই গণহত্যার দিনগুলো আর নেই। কিন্তু তার মতাদর্শ আছে। কত কবি, লেখক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক নিজের আত্মকথা বলতে চেয়েও পারেনি, অনেকেই পালিয়েছেন। তাঁর বাবাই এরকম কত লেখক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানীকে গুলাগের ক্যাম্পে নির্বাসিত করেছে।

মেয়েটির স্মৃতিকথা ১৯৬৩-র সোভিয়েত রাশিয়াতেও নিষিদ্ধ। ভারতীয় রাজদূত টিএন কৌলের মাধ্যমে তার আত্মকথার পাণ্ডুলিপি ভারতে পৌঁছায়। সারা বিশ্বের মানুষের উদ্দেশে লেখা চিঠিগুলো 'Twenty Letters to a Friend' নামে প্রকাশিত হয়। বিশ্বের সবথেকে বড়ো গণহত্যাকারীর মেয়ে হিসেবে নিজের বাবার কুকীর্তি বলার ব্যথা কম নয়। অনেক সমালোচক এই স্মৃতিকথাকে স্তালিনের অপরাধকে আড়াল করে NKVD চিফ বেরিয়ার ঘাড়ে দেওয়ার কৌশল বলে মনে করেন। কিন্তু স্তালিনের মেয়ে শ্বেতলানা আলিলুয়েভা'র এই বেদনাতুর জীবনের স্মৃতিচারণা বিশ্বশান্তির জন্য তার অনবদ্য প্রয়াসের জন্যই প্রশংসনীয়। কারণ একদিকে এই স্মৃতিকথা যেমন তার ব্যথাকেই খুঁচিয়ে দিয়েছিল, আবার অন্যদিকে তার গণহত্যাকারী পিতার সমর্থক দুনিয়া জুড়ে যারা বিশ্বাস করে যে সুখী সমাজ গড়ার পথ স্তালিনের দেখানো বিপ্লবের পথ, স্তালিন তাদের কাছে নায়ক, স্তালিন তাদের আরাধ্য।

গুলাগ থেকে ফিরে এসে আত্মকাহিনি লিখেছেন এরকম লেখক যেমন আছেন, সোভিয়েত রাশিয়া থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়া নেতা, কবি, আধিকারিক প্রচুর, যারা সোভিয়েত রাশিয়ায় মানব সভ্যতার চরমতম দুর্দিনের সাক্ষী। কিন্তু তাদের মধ্যে শ্বেতলানা অনন্যা, কারণ তিনি গণহত্যাকারীকে মেয়ে হিসেবে ভালোবেসেও অকপটেই সত্য তুলে ধরেছেন। স্তালিনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তার পরিবার কীভাবে তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বলি হয়েছিল, তার একমাত্র সাক্ষী তিনি। শ্বেতলানাই সেই মৃত্যুপুরী থেকে সারা বিশ্ববাসীকে কমিউনিজমের বিষ থেকে রক্ষা করতে সঞ্জীবনী এনেছেন। □

## শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, বীরভূম জেলার সিউড়ি নিবাসী, সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্তের পিতৃদেব অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত গত ৮ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার পুরাতন মালদা খণ্ডের আটমাইল শাখার স্বয়ংসেবক তথা মালদা বিভাগের গ্রাম বিকাশ প্রমুখ তপন সরকারের বড়দা সগেন সরকার গত ২৪ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ কন্যা-জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।


*With Best Compliments from -*

**A Well Wisher**

# চিকেনস্ নেক করিডোরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছে ভারত

**কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য**

ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে বিপদের ছায়া। এরই মধ্যে চীনের দিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশ। এই সব ঘটনার আবহে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডোরকে (যা চিকেনস্ নেক নামেও পরিচিত) শক্তিশালী করছে ভারত। বিমস্টেক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ৩ ও ৪ এপ্রিল দু'দিনের সফরে থাইল্যান্ড যান। নয়াদিল্লি দক্ষিণ এশিয়ার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের বিষয়ে বহু দিন ধরেই কড়া নজর রাখছে। বিমস্টেক সম্মেলন চলাকালীন বাংলাদেশের সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে একটি বৈঠকের প্রস্তাব দেন। ভারত অনুরোধটিকে গুরুত্ব দেয় এবং বৈঠকটি হয়। গত বছরের আগস্টে বাংলাদেশ প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই মহম্মদ ইউনুস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রথম সরাসরি আলাপচারিতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য চীনের কাছে অনুরোধ এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিষয়ে মহম্মদ ইউনুসের একটি বিতর্কিত মন্তব্য সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। ইউনুসের এহেন মন্তব্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেনস্ নেক নিয়ে ভারত সরকারের উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ইউনুসের বিতর্কিত মন্তব্যের আবহে বিমস্টেক শিখর সম্মেলনে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক, কূটনৈতিক আলোচনার এই পটভূমি সৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গের এই সংকীর্ণ, ২২ কিলোমিটার শিলিগুড়ি করিডোরটি একটি স্থলপথ যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও সিকিমকে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই সরু স্ট্রিপের উত্তরে নেপাল, ভুটান এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ অবস্থিত। চিকেনস্ নেক ভারতকে তার প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও তিব্বতের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং ভারতের বাকি অংশের মধ্যে সমস্ত স্থল-বাণিজ্য শিলিগুড়ি করিডোরের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। শিলিগুড়ি করিডোরের মধ্য দিয়ে পণ্য পরিবহণের জন্য একটি রেলপথ রয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্তীকরণের ক্ষেত্রে এই রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। চিকেনস্ নেকের পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, এই গুরুত্বপূর্ণ করিডোরটিকে রক্ষা করার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করছে ভারত।

শিলিগুড়ি করিডোরকে নিজেদের সবচেয়ে শক্তিশালী ডিফেন্স লাইন বা প্রতিরক্ষা রেখা হিসেবে বর্ণনা করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। উন্নত সামরিক প্রস্তুতি থাকার দরুন যেকোনো আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারে আজকের ভারত।

শিলিগুড়ি শহরের কাছে সুকনায় থার্টি থ্রি (৩৩) কর্পসের সদর দপ্তর অবস্থিত। তিনটি মাউন্টেন (পার্বত্য) ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত এই কর্পস্। তিনটি ডিভিশন হলো--- সেভেন্টিস্থ (গ্যাংটক), টোয়েন্টিথ্ (বিন্নাগুড়ি) ও টোয়েন্টি সেভেন্থ (কালিম্পং)। সুকনায় অবস্থিত ৩৩ কর্পস্— 'ত্রিশক্তি কর্পস্' নামেও পরিচিত। সমগ্র চিকেনস্ নেক অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ত্রিশক্তি কর্পস। এই কর্পস্ রাফায়েল যুদ্ধবিমান, ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র, উন্নত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম-সহ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

ভারতের সিডিএস (চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ) জেনারেল অনিল চৌহানের একটি সাম্প্রতিক বিবৃতি শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তার বিষয়ে ভারতের অবস্থানের বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছে চিকেনস্ নেক সবচেয়ে শক্তিশালী অঞ্চল, যেখানে যেকোনো বিপদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও উত্তর-পূর্বের বাহিনীকে জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত মোতায়েন করা যেতে পারে।

মানচিত্রে শিলিগুড়ি করিডোর দেখলে মনে হয় যেন অনেকটা মুরগির ঘাড় বা গলার মতো একটি অংশ। এই কারণে এর নাম হলো— চিকেনস্ নেক। ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ, সংকীর্ণ এই ভূমিখণ্ডটি ভারতের একটি দুর্বল স্থান হিসেবে একদা বিবেচিত হতো। সেই সময় আশঙ্কা ছিল যে, শত্রুপক্ষের বড়ো কোনো পদক্ষেপ, বিশেষত ডোকলামের দিক থেকে চীনা আক্রমণের কারণে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে উত্তর-পূর্ব ভারত। ভারতের বর্তমান সামরিক নেতৃত্ব এই ধারণাটিকে উলটে দিয়েছে। শিলিগুড়িকে করিডোরকে একটি দুর্বল স্থানের পরিবর্তে একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করছে বিশেষজ্ঞ মহল। করিডোরটি নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চীন অধিকৃত তিব্বত দ্বারা বেষ্টিত হলেও ভারতের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কারণে বৈরীমনোভাবাপন্ন কোনো দেশের চিকেনস্ নেকের উপর যেকোনো আক্রমণ প্রকারান্তরে বুমেরাং হবে। এই অঞ্চলেই অপেক্ষা করছে শত্রুসেনার মৃত্যু ফাঁদ।

এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করতে ভারতীয় সেনা নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে মিগ বিমানের পাশাপাশি রাফায়েল যুদ্ধবিমানের একটি স্কোয়াড্রন মোতায়েন করেছে। যেকোনো বিদেশি হামলা প্রতিরোধের জন্য শিলিগুড়ি করিডোরে ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের একটি রেজিমেন্ট মোতায়েন করা হয়েছে। আকাশপথে যেকোনো আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ভারত এই অঞ্চলে রাশিয়ার তৈরি এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য , এস-৪০০ হলো ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা।

এছাড়াও এই অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে মিডিয়াম রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল (এমআরএসএএম)। এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি অতিরিক্ত স্তর সংযোজন করে। আকাশপথে যেকোনো অনুপ্রবেশ রোধ করে আকাশসীমার সুরক্ষা নিশ্চিত করে এই ক্ষেপণাস্ত্র। ত্রিশক্তি কর্পস্ নিয়মিত সামরিক মহড়া পরিচালনা করে। এই মহড়াগুলির মধ্যে টি-৯০ ট্যাঙ্কের সঙ্গে লাইভ-ফায়ার মহড়াও অন্তর্ভুক্ত। মহড়াগুলির মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর অপারেশনাল প্রস্তুতি সর্বদা তুঙ্গে থাকে। সেনাবাহিনী ছাড়াও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ), সশস্ত্র সীমা বল এবং ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ-সহ আরও বাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে শিলিগুড়ি করিডোর জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে ভারত সরকার।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে উদ্ভূত নানা বিপদের ক্ষেত্রে ভারত সদাসতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের সাম্প্রতিক মন্তব্য এবং বেল্ট অ্যান্ট রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে নিবিড়ভাবে মূল্যায়ন করছে ভারত। বাংলাদেশের লালমণিরহাট জেলায় চীনের একটি বিমানঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা ভারতের পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আগামীদিনে একটি সংকট হিসেবে উপস্থিত হতে পারে। উল্লেখ্য যে, ভারতের পূর্ব সীমান্তের এই অংশেই চিকেনস্ নেকও রয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, বেইজিঙের সঙ্গে ঢাকার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা ভারতের ভারতের সামনে খাড়া করতে পারে একটি স্ট্র্যাটেজিক চ্যালেঞ্জ। শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তাও এর ফলে বিঘ্নিত হতে পারে।

উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় ভারতও এই অঞ্চলে নিজের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি জোরদার করেছে। ভারতের সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান সেনাবাহিনীর অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফর করেছেন। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় ভারতীয় সেনা প্রস্তুত বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ফরোয়ার্ড পোস্ট (সীমান্তবর্তী ঘাঁটি)-গুলি পরিদর্শন এবং নিরাপত্তা কৌশলের বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক।

শিলিগুড়ি করিডোরের পরিস্থিতির রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সেভেন্টিন কর্পস্। এই বাহিনী 'ব্রহ্মাস্ত্র কর্পস্' নামেও পরিচিত। এটি হলো ভারতের প্রথম মাউন্টেন স্ট্রাইক কর্পস্, যার সদর দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের পানাগড়ে অবস্থিত। চীনা আক্রমণের প্রতিহত করতে এলএসি বা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর কুইক রিঅ্যাকশন ইউনিট হিসেবে গঠিত হয় এই ব্রহ্মাস্ত্র কর্পস্। দ্রুত প্রতিক্রিয়ায় শত্রুসেনার আক্রমণ ঠেকিয়ে পাল্টা আক্রমণ হানাও এই বাহিনীর কাজ। দুটি পদাতিক ডিভিশন, স্বাধীন সাজোয়া ব্রিগেড, বিশেষ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও বিমান চালনা ইউনিট-সহ একটি পূর্ণাঙ্গ স্ট্রাইক কর্পস্ হিসেবে গঠিত হয়েছে এই ব্রহ্মাস্ত্র কর্পস্। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে পার্বত্য যুদ্ধে দক্ষ এই কর্পসের সম্প্রসারণ কিঞ্চিৎ স্তিমিত হলেও শত্রুদেশের আক্রমণ ঠেকানো ও প্রতি-আক্রমণের ক্ষেত্রে কর্পস্‌টি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। পূর্ব ভারতে রাফায়েল যুদ্ধবিমান মোতায়েন, যেকোনো মুহূর্তে মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাটারি এবং আকাশপথে হামলা প্রতিরোধী এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সমন্বিত বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দরুন চিকেনস্ নেক

কৌশলগত দিক থেকে এখন কোনোভাবেই ভারতের দুর্বল স্থান নয়। যেকোনো সময়ে শত্রুসেনার যেকোনো আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে ত্রিশক্তি কর্পস্। শিলিগুড়ি করিডোরের ডিফেন্স ম্যাট্রিক্সের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এই কর্পস্। টি-৯০ ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট, অত্যাধুনিক কামান ও এলিট ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট বা সর্বাপেক্ষা উন্নত পদাতিক বাহিনী সমন্বিত ত্রিশক্তি কর্পস্ নিয়মিতভাবে এই অঞ্চলে হাই-ইনটেনসিটি মিলিটারি এক্সারসাইজ (প্রবল মাত্রার সামরিক মহড়া) পরিচালনা করে থাকে। ভারতীয় সেনার এই ত্রিশক্তি কর্পস্ ইদানীং লাইভ-ফায়ার মহড়াও চালিয়ে যাচ্ছে। এই মহড়ায় ট্যাঙ্ক, রকেট, আর্টিলারি ও মেকানাইজড্ ইনফ্যান্ট্রি (যুদ্ধ ও পরিবহণের ক্ষেত্রে আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার ও ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকলস্ ব্যবহার করে থাকে এই পদাতিক বাহিনী) অংশগ্রহণ করে থাকে। এই সামরিক মহড়াগুলি যুদ্ধ পরিস্থিতির অবিকল প্রতিরূপ। ভারতীয় সেনার এই মহড়াগুলি শত্রুপক্ষের প্রতি প্রেরণ করে একটি স্পষ্ট বার্তা। ভারতীয় সেনা বুঝিয়ে দেয় যে শিলিগুড়ি করিডোর ভারতের কোনো দুর্বল স্থান নয়, এটি একটি অতীব সুরক্ষিত স্থান, যা যেকোনো আক্রমণ ঠেকিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত।

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি সম্পর্কে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন যে, এই মন্তব্য আক্রমণাত্মক ও উসকানিমূলক। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে বাংলাদেশের এহেন মন্তব্য হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সংযোগ রক্ষার জন্য চিকেনস্ নেক এলাকায় আরও ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

হিমন্ত বিশ্বশর্মা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য বা সেভেন সিস্টার্সকে ল্যান্ডলকড্ বা স্থলবেষ্টিত বলে উল্লেখ করেছেন। রাজ্যগুলি স্থলবেষ্টিত হওয়ার কারণে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের নিকটবর্তী বন্দর হলো বাংলাদেশের চট্টগ্রাম। সমুদ্রপথে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির ব্যবসাবাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরে ইউনুস যে বিবৃতি দিয়েছেন তা আপত্তিকর ও অতি নিন্দনীয়। এই মন্তব্যটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ চিকেনস্ নেক করিডোরের ক্ষেত্রে একটি হুমকি স্বরূপ।'

অসমের মুখ্যমন্ত্রী চিকেনস্ নেক করিডোরের নীচে এবং এই করিডোরের চারপাশে শক্তিশালী রেলওয়ে ও সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উপর জোর দেন। তিনি বলেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সংযোগকারী চিকেনস্ নেকের সমান্তরাল এবং বিকল্প সড়কপথ তৈরি এই মুহূর্তে অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এই সড়কপথ তৈরির ক্ষেত্রে সামনে আসতে পারে একাধিক প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জ। তবে দৃঢ় সংকল্প ও উদ্ভাবনীশক্তির মাধ্যমে এই সড়ক নির্মাণ সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, মহম্মদ ইউনুসের এধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়, কারণ হতে পারে এগুলি বাংলাদেশ প্রশাসনের কৌশলগত (স্ট্র্যাটেজিক) পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি অ্যাজেন্ডার অংশ।

চীন সফরকালে মহম্মদ ইউনুসের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। ইউনুস বলেছিলেন যে, ভারতের সাতটি উত্তর- পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সঙ্গে সমুদ্রের কোনো সরাসরি সংযোগ নেই। তাই সমুদ্র সংযোগের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মূল নিয়ন্ত্রক হলো বাংলাদেশ। এর পাশাপাশি ইউনুস চীনকে পরিকাঠামো নির্মাণ ও শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই অঞ্চলে তার অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মহম্মদ ইউনুসের বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ভারতীয় সেনার অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক মেজর জেনারেল গগনদীপ বক্সী বলেন, 'এখন বাংলাদেশ বলছে যে চীনকে সাহায্য করতে হবে এবং ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি করিডোরের উপর নির্ভরশীল সাতটি স্থলবেষ্টিত ভারতীয় রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। তারা বুঝতে পারছে না যে বাংলাদেশেরই বিপরীত দিকে আমরাও একই কাজ করতে পারি। আমরা সমুদ্র পেরিয়ে তাদের শ্বাসরোধ করতে পারি। ইউনুস ভাবছেন যে সাতটি রাজ্যের জন্য সমস্যা তৈরিতে তিনি চীনকে এখানে টেনে আনবেন। ইতিমধ্যেই তাদের নানা কার্যকলাপ এই অঞ্চলে চালিয়ে যাচ্ছে চীন। তবে শুধু চীন নয়, উত্তর-পূর্বে আরও অনেক সংস্থা নানা কাজ করছে।'

মহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের নেতৃত্বগ্রহণের পর থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। সাম্প্রতিক বেইজিং সফরের সময় চীনা বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইউনুস ভারতের বিষয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তিনি বলেছিলেন যে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি সংযোগের ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত পথ হয়ে উঠতে পারে। ইউনুসের এহেন মতামত নয়াদিল্লির ভ্রূ কুঁচকোনোর কারণ হতে পারে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল গগনদীপ বক্সী বলেন, 'ইউনুসের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ভারত সরকার সংবাদমাধ্যমের সামনে এই বিষয়ে এখনই কোনো বক্তব্য পেশ করবে না। ভারত সরকার এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনকী মহম্মদ ইউনুসও জানেন ভারত আগামীদিনে কী করতে চলেছে।'

**(লেখক পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের রাজ্য সভাপতি)**


**SWASTIKA ADVERTISEMENT TARIFF (ONE INSERTION)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Back Cover | (Multi Colour) | Rs. | 32,000.00 |
| Front Inside | (Multi Colour) | Rs. | 25,000.00 |
| Back Inside | (Multi Colour) | Rs. | 25,000.00 |
| Full Page | (Multi Colour) | Rs. | 20,000.00 |
| Full Page | (Black & White) | Rs. | 15,000.00 |
| Half Page | (Black & White) | Rs. | 8,000.00 |
| Qtr. Page | (Black & White) | Rs. | 4,000.00 |

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

# যুদ্ধে গেলে পাকিস্তানের পরিণতি কী হতে পারে?

নৃসিংহ অবতারের কথা মনে আছে? হিরণ্যকশিপু ছিল এমন এক দানব যাকে না দিনে না রাতে, না মানুষ না পশু, না অস্ত্রে না হাতে এবং না ভূমিতে না অন্তরীক্ষে বধ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করতে করতে গোধূলি লগ্নে সে একটি স্তম্ভে মারলো এক লাথি। তখন ঘটল নৃসিংহদেবের আবির্ভাব, উরুতে বসিয়ে নখ দিয়ে উদর বিদীর্ণ করে তাকে হত্যা করলেন শ্রীভগবান।

পাকিস্তান সম্ভবত আজ সেই সন্ধিক্ষণে। যখন রাশিয়া বা আমেরিকা ভারতকে পর্যাপ্ত তেল বিক্রি করতো না তখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাওয়া ভারতের পক্ষে ভূ-রাজনৈতিকভাবে ভুল ছিল। কারণ আরব দুনিয়া থেকে তেল কিনত ভারত। ভারতীয় বিমানগুলি ব্যবহার করত পাকিস্তানের আকাশপথ। কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের কাছে অনেক টাকা আসতো। ভারতের সেকুলার সরকারগুলির পাকিস্তানের প্রতি ছিল অতিরিক্ত সহানুভূতি। পাকিস্তানের হাতে থাকা পরমাণু বোমার কারণে তাদের প্রতি ছিল তদানীন্তন ভারত সরকারের অতিরিক্ত সমীহ। পাকিস্তানের প্রতি চীনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদত— সব মিলিয়ে এই অসুরবধ প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তানের জন্য বোধহয় আজকে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। কারণগুলি ভাবা যাক :

১. বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টির শাসন যারা রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবাদী, যাদের আজকের প্রতিপক্ষ চীন। 'চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর'-এর মাধ্যমে জিনজিয়াং থেকে বালোচিস্তানের গোয়াদর বন্দর পর্যন্ত সড়ক সংযোগ ও নানা পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চীনকে আরব সাগরের নাগাল পেতে সাহায্য করছে পাকিস্তান। চীন যদি পাকিস্তান হয়ে গোয়াদর বন্দর পৌঁছে যায়, তাহলে চীনের জ্বালানি, উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিবহণ খরচ কমে আসবে এক ধাক্কায়। আর সেই পথে বাধা বালুচ স্বাধীনতাকামীরা, যারা ভারতকে সঙ্গে চায়। ফলে আজকের আমেরিকা বিনা কারণে এই মুহূর্তে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে আসবে না।

২. চীন আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধে একটা বিকল্প বাজার এবং বন্ধু চায়। আবার পাকিস্তানকেও চায় উপরোক্ত কারণে। কিন্তু এই অবস্থায় সরাসরি পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত ও আমেরিকা দু'জনকে উলটো দিকে দাঁড় করাতে রাজি হবে না।

৩. রাশিয়া ভারতের অনেক পুরোনো বন্ধু।

৪. আমেরিকা ও রাশিয়া বর্তমানে কম দামে তেল বিক্রি করছে, তাই ইসলামি বিশ্ব বিরাগভাজন হলে ভারতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব কম।

৫. ইসলাম থেকে নাৎসি। বিভিন্ন শক্তির হাতে ভয়াবহভাবে নির্যাতিত হয়েছে ইহুদিরা। পৃথিবী জুড়ে ইহুদি হত্যার মধ্যে ভারত হলো একমাত্র দেশ যারা তাঁদের আশ্রয় দেয়। নেহরু-ইন্দিরার ভুল নীতি বর্জন করেছে বর্তমান ভারত সরকার। ফলে আজকের ইজরায়েল সবদিক থেকে ভারতের পাশে থাকবেই।

৬. আফগান বা পাশতুনরা বিশ্বাস করে ডুরান্ড লাইন তাঁদের উপর ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া একটি সীমারেখা। খাইবার পাখতুনখোয়া আফগানিস্তানের অংশ বলে তাঁদের দাবি। আফগানিস্তানকে গত ২০ বছর ভারত টানা সাহায্য করে এসেছে। আমেরিকা চলে যাওয়ার পরেও তারা তাদের খাদ্যের জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল ছিল। কাশ্মীরে পাক মদতে জঙ্গি হামলার কারণে ভারত পাকিস্তানের উপর প্রত্যাঘাত করলে আফগান ও পাক তালিবানের কাছে খাইবারকে স্বাধীন ঘোষণার এই একটা সুযোগ।

৭. **বালোচিস্তান :** বালুচরা বহুদিন পাকিস্তানের কবল থেকে স্বাধীনতা চাইছে। জঙ্গি হামলার প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত কোনো সামরিক অভিযান করলে তাঁরা সহযোগিতা করবে এবং নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।

৮. **সিন্ধু প্রদেশ :** কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য ক্যানালের মাধ্যমে সিন্ধু নদের জল পাকিস্তান সরকার পঞ্জাব প্রদেশে নিয়ে যাওয়ায় গত দশ বছর পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে চলছে তীব্র জল সংকট। এই অবস্থায় সিন্ধু প্রদেশ চাইছে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এই সুযোগে তারাও পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

৯. সবচেয়ে আশ্চর্য হলো পাক পঞ্জাব। ১৯৪৭-এর পর পাক পঞ্জাবে হয়নি কোনো ভূমি সংস্কার। যে পঞ্জাবের জমিদার ও এলিটরা গত ৭৭ বছর ধরে খাইবার, বালোচিস্তান, সিন্ধু প্রদেশ, গিলগিট-বাল্টিস্তান ও কাশ্মীরের একটা অংশকে পরাধীন করে কোটি কোটি টাকা লুটেছে, সেই পঞ্জাবেরই সাধারণ মানুষের অবস্থা অতি শোচনীয়। বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে সিন্ধুর জল আজকে নিয়ে যেতে হচ্ছে পঞ্জাবে। তাদের নায়ক ইমরান খান জেলে। তারাও চায় পাক সেনার কবল থেকে ইমরান মুক্তি পাক।

ফলে পাকিস্তানের টেরর ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করতে ভারত এবার কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিলে এবং সেই প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, বা পাকিস্তানি সেনা ভারত আক্রমণ করলে সেই যুদ্ধ এমনিতেই বেশিদিন চলবে না। পাকিস্তানের সেনায় চাকরি ছাড়ার সংখ্যা বাড়ছে।

এই অবস্থায় পাকিস্তান ভেঙে চার-পাঁচ টুকরো হলে ভারতের প্রতিরক্ষা খরচ স্থায়ীভাবে কমলেও বাড়বে ভারতের প্রতি নির্ভরশীল কিছু প্রতিবেশী। তবে আরও অনেক ব্যাপারে ভাববে ভারত সরকার। আগামী কয়েক দিনেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব কিছু। হয়তো এই লেখা প্রকাশ হওয়ার মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। □

## মুর্শিদাবাদ থেকে পহেলগাঁও

# হিন্দু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পদযাত্রা

মুর্শিদাবাদ ও কাশ্মীরে হিন্দুদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গর্জে উঠল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। কাশ্মীরে পাক মদতপুষ্ট জেহাদিদের দ্বারা নিরীহ হিন্দু পর্যটকদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গত ২৫ এপ্রিল কলকাতা শহরে একটি বৃহৎ প্রতিবাদী পদযাত্রায় শামিল হন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তা, সাধুসন্ত ও অসংখ্য সাধারণ মানুষ। শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে দুটি বড়ো পদযাত্রা এদিন কলকাতার বুকে সংঘটিত হয়। শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে শুরু হয়ে দুটি পদযাত্রাই এদিন মিলিত হয় ধর্মতলায়। শিয়ালদহ থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রাটি

কলেজ স্কোয়ারের দিকে যায়। সেখানেও আগে থেকেই জমায়েত করেছিলেন পরিষদের কার্যকর্তারা। এরপর পদযাত্রাটি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ধর্মতলা হয়ে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত পৌঁছায়। হাওড়া থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রাটি হাওড়া ব্রিজ হয়ে ধর্মতলা পৌঁছায়। পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী হিন্দুদের স্লোগান ছিল— 'মুর্শিদাবাদ থেকে পহেলগাঁও, জঙ্গি মুক্ত ভারত চাই', 'মুর্শিদাবাদ থেকে কাশ্মীর হিন্দু হত্যার বদলা চাই, মুসলিম জেহাদি জঙ্গিদের ফাঁসি চাই।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর তাণ্ডবে ভারতে হিন্দু হত্যার ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর জেহাদি আক্রমণ এবং গত ২২ এপ্রিল বেছে বেছে ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে নৃশংস হত্যার দৃষ্টান্ত গোটা ভারতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে জেহাদিদের প্রকৃত স্বরূপ। পাক জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার সহযোগী সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)-এর বেশ কয়েকজন জঙ্গি কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে হিন্দু পর্যটকদের উপর হামলা চালায়। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশব্যাপী গর্জে উঠেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু হত্যার বদলা এবং মুসলমান জেহাদিদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা।

এদিন কলকাতায় সংঘটিত এই প্রতিবাদী পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতি দিলীপ ঝাওয়ার, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী মানিকচন্দ্র পাল, দুর্গাবাহিনী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজিকা পারমিতা পাল, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস, প্রান্ত সহ-সম্পাদক প্রতীপরঞ্জন সমাদ্দার ও জয়দেব মাইতি, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ অরিন্দম কর, বিশ্ব হিন্দু বার্তার প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়ন্ত ভৌমিক, পরিষদের উত্তর কলকাতা বিভাগ সংগঠন সম্পাদক অনির্বাণ ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা। পদযাত্রা থেকে পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান উঠতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হিন্দু নিপীড়নের বিরুদ্ধেও ফেটে পড়েন পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা। এদিনের পদযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুসমাজের ঐক্য ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা এবং নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি। পদযাত্রায় ছিল ব্যানার, স্লোগান, ধর্মীয় সংগীত এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা। শান্তিপূর্ণভাবে এদিন পদযাত্রাটি সম্পন্ন হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বক্ষেত্রের মুখপাত্র অরবিন্দ শর্মা বলেন, 'এটি একটি ধর্মীয় পদযাত্রা নয়। এটি সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও আদর্শ জীবনযাত্রার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা।'

## জেএনইউ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয় এবিভিপি-র

সম্প্রতি দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বামপন্থীদের পরাজিত করে সর্বাধিক আসন ও যুগ্ম সম্পাদক পদটি ছিনিয়ে নিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে বাম আধিপত্যকে খর্ব করে যুগ্ম সম্পাদক পদে এবিভিপি-র প্রার্থী বৈভব মীনা জয়লাভ করেছেন। জেএনইউ-র ১৬টি স্কুল ও কেন্দ্র থেকে মোট ৪২টি কাউন্সিলর আসনের মধ্যে ২৪টিতে জিতেছে এবিভিপি। পরিষদের এই জয় জাতীয়তাবাদী আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মাইলফলক।

# গল্পকথায় ডাক্তারজী

(১৪)

**স্বাদেশিকতা ও বিপ্লবী সঙ্গ**

পরীক্ষা শেষ হলে সবাই একটু খেলাধুলা, ঘোরাফেরা ভ্রমণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে চায়। তাছাড়া প্রবেশিকা পরীক্ষা বলে কথা, এত বড়ো চাপ থেকে মুক্ত হয়ে খোলামেলা, একটু বাঁধনহারা পরিবেশ খোঁজা তা স্বাভাবিক। পরীক্ষান্তে সব ছেলেরা বাড়ি ফিরে সেই আনন্দ জোগাড়ের কাজেই লেগে গেল। কিন্তু কেশবের আনন্দ তো ভিন্ন কাজে। সময়টুকু দেশের কাজের জন্য কী করে লাগানো যায় সে নানান সর্বজনীন কাজে যোগদান করা শুরু করল। নাগপুর থেকে কিছু দূরে রামটেকে রামনবমী উপলক্ষ্যে বেশ বড়ো মেলা হয়। এই মেলার বিখ্যাত মিষ্টি পেঁড়ার খুব চাহিদা। কিন্তু মিষ্টি তৈরির চিনি আসতো জাভা থেকে। কেশব উদ্যোগ নিল কীভাবে গুড় দিয়ে স্বদেশী পেঁড়া তৈরি করা যায়। তাঁর চেষ্টায় তৈরি হলো পর্যাপ্ত পরিমাণে গুড়ের পেঁড়া। দামও কম। সকলে এই স্বদেশী পেঁড়ার স্বাদে মজে উঠল।

কিন্তু এটুকু করলে তো হবে না, স্থানীয় বিপ্লবী তরুণদের কাছে নিয়মিত যাতায়াত ও গুপ্ত বৈঠকে যোগদান তাঁর প্রধান কার্য হয়ে দাঁড়ালো। এর ফলে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা বিভিন্ন বিপ্লবী তরুণদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হতেন। সারাদেশে বিপ্লবের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। এই সময় মাধবদাস সন্ন্যাসী নামে এক বাঙ্গালি বিপ্লবী নাগপুরে আসেন। বিপ্লবী দলের নির্দেশে তার জাপান যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পূর্ণ যোজনা তৈরি ও অর্থসংগ্রহের জন্য তাকে কিছুদিন লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল। কেশব নিজে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং সন্তর্পণে মোহপার আপ্পাজী হলদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করলো। বয়সে বড়ো হলেও বিপ্লবী মাধব দাস কেশবকে খুব শ্রদ্ধা করতেন শুধু নয়, তিনি ছিলেন কেশবরাওয়ের একজন অন্যতম গুণগ্রাহী। কেশবের দেখাশোনায় ছ' মাস ছিলেন তিনি নাগপুরে। তারপর একদিন বিপ্লবী দলের নির্দেশে তাকে পরিকল্পনা মতো পাঠিয়ে দেওয়া হলো জাপান।

(১৫)

**লক্ষ্যপথে**

তখনকার দিনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা ব্যক্তি পর্যাপ্ত শিক্ষিত বলেই পরিগণিত হতেন এবং তার পক্ষে একটা ভালো কর্মসংস্থান জোগাড় করে সংসার জীবনে প্রবেশ করে নিরাপদ জীবন যাপন কোনো কঠিন বিষয় ছিল না। কেশবরাও এটা পারতো। আর তাছাড়া তাতে সংসারের আর্থিক অনটনও দূর হতো। কিন্তু যার মনে সর্বদা ইংরেজদের দাসত্ব থেকে দেশকে কীভাবে মুক্ত করা যায়, এই চিন্তা ঘুরপাক খায়, তাঁর নিজের অভাব থেকে মুক্তি পাবার চিন্তার সময় কোথায়! বরং নিজের পথটা যুক্ত করতে সেই পথের সঙ্গে যেখান থেকে স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোনো সুগম হতে পারে। কেশব ঠিক করলো উচ্চশিক্ষা লাভ করতে হবে। অর্থ সংগ্রহের জন্য সে কিছু টিউশন শুরু করলো। কিছুদিন ইতোয়ারীর এক পাঠশালায় শিক্ষকতাও করেছে সে। কেশব রাওয়ের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী ডাঃ মুঞ্জেও তার উচ্চশিক্ষার কথা ভেবে কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার প্রস্তাব দিলেন। কেশবের বিপ্লবী বন্ধুরাও এতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করলো। এই আগ্রহের পেছনে প্রকৃত কারণ ছিল এরা কলকাতায় বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত, কেশব সেখানে গেলে বিপ্লবী কাজের সঙ্গে যোগাযোগের পথটা সহজ হবে। পরবর্তীকালে কেশবরাওয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামলাল বাজপেয়ী নিজের জীবনীতে লিখেছেন— 'কেশবের কলকাতায় যাবার উদ্দেশ্য যতটা না উচ্চশিক্ষা লাভ ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।' তিনি লিখেছেন— 'কেশবরাও হেডগেওয়ার, সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাকে। দাজীসাহেব বুটীর কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে শিক্ষালাভ ছাড়া পুলিনবিহারী দাস (কলকাতার বিপ্লবী)-এর তত্ত্বাবধানে বিপ্লব ও সংগঠনের জন্য প্রেরণ করা হলো।' শেষ পর্যন্ত ডাঃ মুঞ্জের যোজনায় বন্ধুদের সহযোগিতায় ১৯১০ সালের মাঝামাঝি কেশব নাগপুর থেকে কলকাতায় প্রায় সাতশো মাইল দূরে এক বৃহৎ লক্ষ্যের পথে যাত্রা করলেন।

সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস